জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ

সম্পূর্ণ উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত এশিয়া মহাদেশের উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তার এত বেশি যে, পৃথিবীর প্রায় সব ধরনের জলবায়ু এই মহাদেশে দেখা যায়। কোনো দেশ বা মহাদেশের জলবায়ুর সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্ভিদের একটা নিবিড় সম্পর্ক থাকে। জলবায়ুর উপর নির্ভর করে স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। আবার স্বাভাবিক উদ্ভিদের চরিত্র জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে নিরক্ষীয় জলবায়ুতে জন্মায় চিরহরিৎ বা চিরসবুজ উদ্ভিদ। আবার মরু অঞ্চলে জন্মায় কাঁটাজাতীয় উদ্ভিদ।

এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈচিত্র্যের কারণ

ধারণা মানচিত্র থেকে বুঝে নাও

অক্ষরেখার অবস্থান

নিরক্ষরেখা থেকে যত মেরুর দিকে যাওয়া যায় সূর্য রশ্মি তত বাঁকা ভাবে পড়ে ফলে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা কমে যেতে থাকে।

এশিয়া মহাদেশটি ১০° দঃ অক্ষরেখা থেকে ৮২° উঃ অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত।

তাহলে এশিয়ার দক্ষিণ থেকে উত্তরে কী ধরনের জলবায়ু দেখা যাবে?

উচ্চতার তারতম্য

প্রতি ১০০০ মি. বা ১কিমি উচ্চতায় গড়ে ৬.৪° সে. করে তাপমাত্রা কমে যায়।

এশিয়া মহাদেশের মধ্যভাগের উঁচু পার্বত্য অঞ্চলের গড় উচ্চতা ৪০০০ মিটারেরও বেশি। **তাহলে সেখানে তাপমাত্রা কীরকম হতে পারে?**

সমুদ্র থেকে দূরত্ব

সমুদ্রের ধারে ঠান্ডা গরম কোনোটাই খুব বেশি হয় না। অর্থাৎ নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু দেখা যায়। কিন্তু সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত কোনো স্থানের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন হয় অর্থাৎ শীতকালে প্রচণ্ড ঠান্ডা আর গরমকালে প্রচণ্ড গরম হয়।

এশিয়ার মধ্যভাগের বেশির ভাগ অঞ্চলেরই সমুদ্র থেকে দূরত্ব বেশি। **তাহলে ঐ অঞ্চলের জলবায়ু কেমন হতে পারে?**

এশিয়ার জলবায়ু অঞ্চল

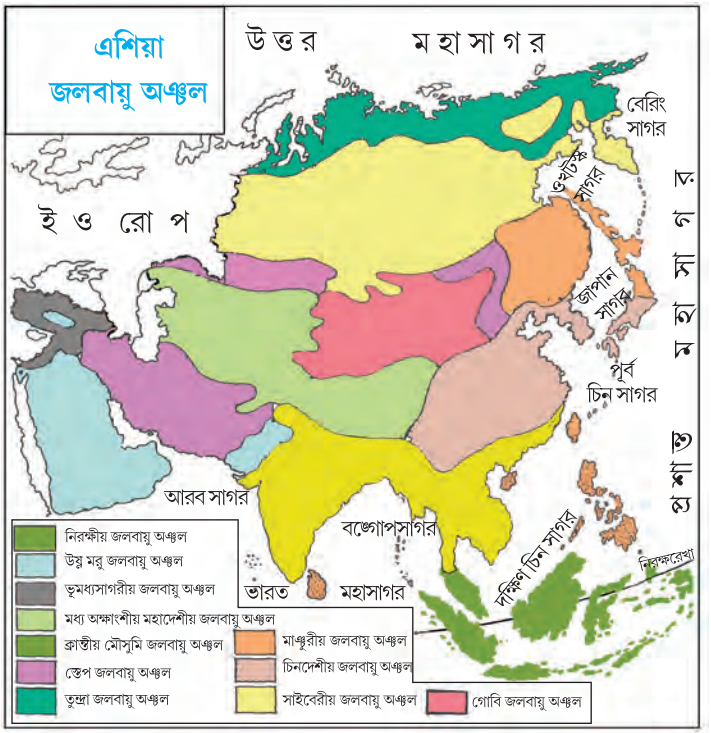

জলবায়ুর বৈচিত্র্য অনুসারে এশিয়া মহাদেশকে বেশ কয়েকটি জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করা যায়—

জলবায়ু অঞ্চল	প্রধান বৈশিষ্ট্য	স্বাভাবিক উদ্ভিদ
নিরক্ষরেখার কাছাকাছি ১০° উত্তর অক্ষরেখা থেকে ১০° দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে **নিরক্ষীয় জলবায়ু** দেখা যায়।	✦ সূর্য রশ্মি লম্বভাবে পড়ায় সারাবছর অধিক উষ্ণতা। ✦ বার্ষিক গড় উষ্ণতা ২৫° থেকে ৩০° সে.। ✦ প্রতিদিন বিকেলে পরিচলন বৃষ্টি হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০ থেকে ২৫০ সেমি.।	নিরক্ষীয় অঞ্চলে বেশি উষ্ণতা ও বেশি বৃষ্টিপাতের জন্য ঘন চিরহরিৎ বা চিরসবুজ গাছ দেখা যায়। যেমন - মেহগনি, রোজউড,আয়রন উড, সেগুন, আবলুস, রবার, কোকো, সিঙ্কোনা।
১০° উত্তর অক্ষরেখা থেকে ৩০° উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, দক্ষিণ চিন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে **মৌসুমি জলবায়ু** দেখা যায়।	✦ মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে বছরের ছ'মাস উত্তর-পূর্ব পরের ছ'মাস দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে বায়ু	আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং শুষ্ক শীতকাল বলে এখানে চিরহরিৎ বা চিরসবুজ এবং

জলবায়ু অঞ্চল	প্রধান বৈশিষ্ট্য	স্বাভাবিক উদ্ভিদ
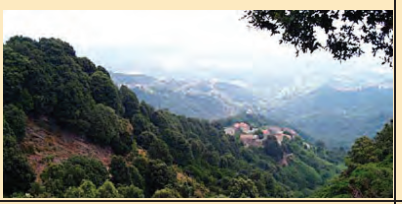	প্রবাহিত হয়। ✦ গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা থাকে ২০°-২৮° সে. আর শীতকালে ১৫°-২০° সে.। ✦ গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে ১০০-২০০ সেমি.।	পর্ণমোচী বা পাতাঝরা দুই ধরনের গাছই জন্মায় (আম, জাম, মেহগনি, বাঁশ, আবলুস, শাল, সেগুন, বট, অশ্বত্থ, শিশু প্রভৃতি)।
চিনের উত্তরাংশ ও মধ্যভাগ, এবং দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের কিছু অংশে বিশেষ ধরনের জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ দেখা যায় যা **চিন দেশীয় জলবায়ু** নামে পরিচিত।	✦ এখানে গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা থাকে ৩০° সে.। শীতকালে উষ্ণতা থাকে ৪°-১২° সে.। ✦ গ্রীষ্মকালে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে গড়ে ১০০ সেমি. বৃষ্টিপাত হয়।	পর্ণমোচী (সেগুন, ফার, বিচ, পাম, লরেল) এবং চিরহরিৎ (মেহগনি, চেস্টনাট, ওক প্রভৃতি) গাছ জন্মায়।
ভূমধ্যসাগরের তীরে সিরিয়া, লেবানন, তুরস্ক, ইজরায়েল, জর্ডন প্রভৃতি দেশে **ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু** দেখা যায়। 	✦ এখানে গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা থাকে ২১°-২৭° সে.। ✦ শীতকালে ৫°-১০° সে.। ✦ পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে এখানে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩০-৫০ সেমি.।	প্রচুর ফলের গাছ যেমন- জলপাই, আঙুর, লেবু, এছাড়া অন্যান্য গাছগুলো হলো- কর্ক, ওক, অলিভ এবং কয়েকটি ঝোপঝাড় জাতীয় গাছ জন্মায়। যেমন—লরেল, ল্যাভেন্ডার, রোজমেরি।
আরবের মরুভূমি, ভারত ও পাকিস্তানের থর মরুভূমি, ইরাক, ইরান, কুয়েত- এই সব দেশগুলোর উষ্ণতা খুব বেশি ও বৃষ্টিপাত খুব কম, তাই এখানে **উষ্ণমরু** প্রকৃতির চরমভাবাপন্ন জলবায়ু দেখা যায়। 	✦ গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা থাকে ৩০°-৩৫° সে.। ✦ শীতকালে উষ্ণতা থাকে ১৫°-২৫°সে.। ✦ এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ১০-২৫ সেমি.। ✦ এশিয়া মহাদেশের উষ্ণতম স্থান পাকিস্তানের **জেকোবাবাদ** (উষ্ণতা ৫২° সে., এই জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত)।	এই মরুভূমি অঞ্চলে সাধারণত কাঁটাজাতীয় গাছ জন্মায়, যেমন--- বাবলা, ফণীমনসা, খেজুর ইত্যাদি। বৃষ্টিপাত কম হবার জন্য গাছগুলির কাণ্ড ও পাতা মোম জাতীয় পদার্থ দিয়ে ঢাকা থাকে যাতে প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় গাছের জল বেরিয়ে না যায়।

জলবায়ু অঞ্চল	প্রধান বৈশিষ্ট্য	স্বাভাবিক উদ্ভিদ
রাশিয়ার সাইবেরিয়া ও সাখালিন দ্বীপপুঞ্জে **সাইবেরীয় জলবায়ু** দেখা যায়। আরো উত্তরে সুমেরু বৃত্তে **তুন্দ্রা জলবায়ু** দেখা যায়। 	✦ এখানে অতিশীতল ও দীর্ঘস্থায়ী শীতকাল। বছরের ৭ থেকে ৮ মাস বরফ পড়ে। উষ্ণতা থাকে হিমাঙ্কের নীচে। গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা থাকে গড়ে১৫° সে.। ✦ তুন্দ্রা জলবায়ু অঞ্চলে বছরের বেশীরভাগ সময় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে থাকে। শীতকালে প্রবল তুষারপাত হয়।	গাছগুলি শঙ্কু আকৃতির হয় এবং গাছের পাতাগুলি সুঁচালো হয়। পাইন,ফার, স্প্রুস, লার্চ, বার্চ, সিডার, উইলো প্রভৃতি গাছ জন্মায়। রাশিয়ার সরলবর্গীয় গাছের **তৈগা** বনভূমি পৃথিবীর বৃহত্তম সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি। তুন্দ্রা জলবায়ু অঞ্চলে মস, লাইকেন, শৈবাল জন্মায়।

চিনের ইয়াংসি নদী অববাহিকা

এশিয়া মহাদেশের একটি উন্নত সমৃদ্ধশালী অঞ্চল হলো ইয়াংসি নদীর অববাহিকা অঞ্চল। ইয়াংসি এশিয়া মহাদেশের দীর্ঘতম নদী (৫৫৩০ কিমি.)।

ইয়াংসি নদীটি কুয়েনলুন পর্বতের একটি হিমবাহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তারপর পূর্ব দিকে বয়ে গিয়ে চিন সাগরে মিশেছে।

ভূপ্রকৃতির পার্থক্য, মৃত্তিকা ও জলবায়ুর পার্থক্যের জন্য ইয়াংসি নদীর অববাহিকাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ইয়াংসি নদীর অববাহিকা

ইয়াংসি নদীর উৎস অঞ্চলে চারটি উপনদীর সঞ্চয় কার্যের ফলে **সেজুয়ান অববাহিকা** তৈরি হয়েছে। এই অববাহিকাটি লাল রঙের বেলে পাথর দিয়ে তৈরি বলে একে **রেড বেসিন** বলা হয়। এই রেড বেসিন অববাহিকাটি **উৎস** থেকে **ইচাং** পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার জলবায়ু খুব মনোরম। এই অববাহিকা কৃষি সমৃদ্ধ জনবহুল অঞ্চল।

ইচাং থেকে হুনান পর্যন্ত মধ্য ইয়াংসি অববাহিকাটি উর্বর সমতল ভূমি। এই অঞ্চলটিতে নবীন পলিমাটি থাকার জন্য এখানে কৃষিকাজ খুব ভালো হয়। এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান চাষ হয়। এই জন্য **হুনান প্রদেশকে চিনের ধানের গোলা বলা হয়**। ধান ছাড়া এখানে গম, কার্পাস, আখ, তৈলবীজ প্রভৃতি ফসল প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়। ইয়াংসি কিয়াং-এর মধ্য অববাহিকায় প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন হয় বলে একে **চিনের শস্য ভাণ্ডার বলা** হয়।

হুনান থেকে চিন সাগরের মোহনা পর্যন্ত অঞ্চলটি ইয়াংসি কিয়াং-এর ব-দ্বীপ অঞ্চল। ইউরোপ মহাদেশের হল্যান্ডের মতো এই অঞ্চলটিতে বহু জলাভূমি, খাল ও সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা জমি বা পোল্ডারভূমি দেখা যায় বলে এই অঞ্চলকে **এশিয়ার হল্যান্ড** বা **চিনের হল্যান্ড** বলা হয়। নিবিড় কৃষি পদ্ধতিতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলে অবস্থিত **সাংহাই** চিনের বৃহত্তম শহর, শিল্পকেন্দ্র ও শ্রেষ্ঠ বন্দর। কার্পাস বয়ন শিল্পের উন্নতির জন্য একে **চিনের ম্যাঞ্চেস্টার** বলা হয়।

ইয়াংসি অববাহিকায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণ

কৃষির উন্নতি

অনুকূল জলবায়ু, উর্বর পলিমাটি, বিস্তীর্ণ সমভূমি

খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য

কয়লা, আকরিক লোহা, তামা, দস্তা, টাংস্টেন প্রভৃতি।

- উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা
- পর্যাপ্ত জলসম্পদ
- সাংহাই, নানকিং, চুংকিং বন্দরের অবস্থান
- ঘনবসতি, সুলভ শ্রমিক
- উন্নত পরিকাঠামো

শিল্পের উন্নতি

লৌহ ইস্পাত, রাসায়নিক, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, রেশম ও বস্ত্রবয়ন শিল্প।

জাপানের টোকিয়ো-ইয়োকোহামা শিল্পাঞ্চল

জাপানের প্রধান চারটি দ্বীপের বৃহত্তম দ্বীপ হলো হনসু। হনসুর পূর্বাংশে সাতটি অঞ্চল নিয়ে কান্টো সমভূমি গঠিত হয়েছে। এগুলো হলো— গানমা, তোচিগি, ইবারকি, সাইতামা, টোকিয়ো, চিবা এবং কানাগাওয়া। এই সমভূমির জনবসতি অত্যন্ত ঘন। গোটা জাপানের ৩ ভাগের ১ ভাগ লোক এই অঞ্চলে বসবাস করে। টোকিয়ো উপসাগরকে কেন্দ্র করে এই সমভূমি বিস্তার লাভ করেছে। টোকিয়ো উপসাগরের ধারে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু বড়ো শহর যেমন- টোকিয়ো , ইয়োকোহামা, কাওয়াসাকি, চিবা। এই শহরগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো সমুদ্র সান্নিধ্য। সমুদ্রের ধারে অবস্থিত হওয়ায় শহরগুলোর প্রত্যেকটিতে বন্দর আছে। বন্দরগুলো জাপান তথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে বন্দরগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বন্দরগুলোর ওপর নির্ভর করে কান্টো সমভূমিতে গড়ে উঠেছে জাপানের শ্রেষ্ঠ শিল্প এলাকা— **কিহিন শিল্পাঞ্চল বা টোকিয়ো-ইয়োকোহামা শিল্পাঞ্চল।**

টোকিয়ো-ইয়োকোহামা শিল্পাঞ্চল

টোকিয়ো: জাপানের রাজধানী টোকিয়ো একদিকে যেমন জাপানের বৃহত্তম শহর, বন্দর এবং বৃহত্তম শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র, তেমনি অন্যদিকে জাপানের শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান।

ইয়োকোহামা: হনসু দ্বীপের দক্ষিণ দিকে, টোকিয়ো থেকে প্রায় ৩০ কিমি. দূরত্বে অবস্থান করছে ইয়োকোহামা। জাপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, ইয়োকোহোমা জাপানের সর্ববৃহৎ বন্দর। টোকিয়ো বন্দরের কাছে উপসাগরের গভীরতা কম, তাই বড়ো বড়ো জাহাজ এই টোকিয়ো বন্দরে প্রবেশ করতে পারে না। ইয়োকোহামা এই দেশের বৃহত্তম বহির্বন্দর হিসাবে কাজ করে।

টোকিয়ো - ইয়োকোহামা শিল্পাঞ্চলের শিল্প

- কার্পাস বস্ত্রবয়ন
- পশম
- কাগজ
- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ
- জৈবপ্রযুক্তি

- লৌহ-ইস্পাত
- মোটর গাড়ি
- বিমান নির্মাণ
- ইলেকট্রনিকস্
- তথ্যপ্রযুক্তি

টোকিয়োর সমস্যা

- অত্যন্ত জনবহুলতা
- জমির অভাব
- সীমাবদ্ধ পরিবহন
- পরিবেশ দূষণ

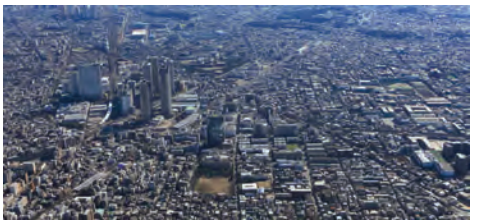

সমাধানের পথ

- কারখানাগুলো অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। বিশেষত চিবা, ইবারাকি শহরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে জাপান সরকার।

ইয়োকোহামার বিশেষ বৈশিষ্ট্য

- গোটা বিশ্বকে নগর পরিকল্পনার ব্যাপারে নতুন দিশা দেখিয়েছে এই শহর।
- জাপান সরকার কর্তৃক (২০০৮ সালে) আদর্শ **পরিবেশ-বান্ধব শহর** হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
- শিল্প-দূষণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছে।
- শিল্পের পাশাপাশি কৃষিকাজকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- বর্জ্য পদার্থের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্ব্যবহার করা হচ্ছে।
- পতিত জমি পুনরুদ্ধার এবং জমির পুনর্বিন্যাসের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বলতে পারো?

- কিহিন শিল্পাঞ্চল বা টোকিয়ো- ইয়োকোহামা শিল্পাঞ্চল জাপানের শ্রেষ্ঠ তথা পৃথিবীর এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল হিসেবে গড়ে ওঠার কারণগুলো কী?
- একটা শিল্পাঞ্চলে কী কী সমস্যা হতে পারে?
- শিল্পাঞ্চলের সমস্যা সমাধান কীভাবে করা যেতে পারে?

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার তৈল বলয়

খনিজ তেল উত্তোলনে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলো পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। সারা পৃথিবীতে যত পরিমাণ খনিজ তেল সঞ্চিত আছে তার ৬০ শতাংশই আছে এই অঞ্চলে। পৃথিবীর মোট খনিজ তেল উত্তোলনের প্রায় ৩০ শতাংশই এই অঞ্চলে উত্তোলিত হয়। এখানকার প্রধান খনিজ তেল উত্তোলনকারী দেশগুলো হলো সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, কুয়েত, বাহরিন ইত্যাদি। সৌদি আরব, পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপ, আরব উপদ্বীপের বৃহত্তম রাষ্ট্র। উষ্ণ মরুভূমি প্রধান সৌদি আরবে পৃথিবীর ২৬ শতাংশ খনিজ তেল সঞ্চিত আছে।

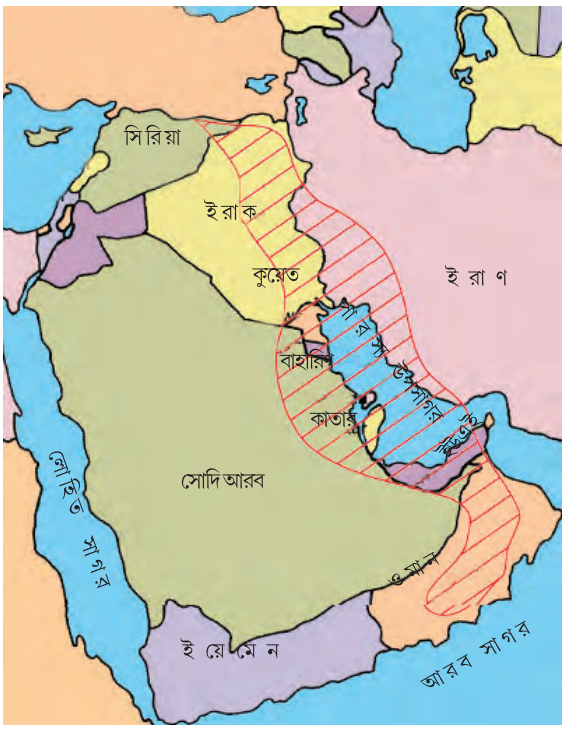

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার জনবসতি কম। তাই খনিজ তেলের চাহিদাও বেশি নয়। সেই কারণে, যে পরিমাণ খনিজ তেল উৎপাদন হয় তার বেশির ভাগটাই রপ্তানি করা হয়।

আধুনিক যন্ত্র নির্ভর সভ্যতা খনিজ তেলের ওপর নির্ভরশীল। যানবাহন চালাতে, বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে, কারখানার যন্ত্রপাতি সচল রাখতে খনিজ তেল অপরিহার্য। তাছাড়া প্লাস্টিক, কৃত্রিম রবার, রং, কৃত্রিম তন্তু এধরনের বহু জিনিস তৈরিতে খনিজ তেল ব্যবহার করা হয়।

বিশ্বের বাজারে খনিজ তেলের দাম কত হবে, কোন দেশ কত পরিমাণ খনিজ তেল বিদেশে বিক্রি করবে— সবটাই ঠিক করে OPEC (ওপেক)। পৃথিবীর প্রধান প্রধান তৈল উৎপাদক দেশ এর সদস্য। OPEC-এর পুরো নাম হলো Organisation of Petroleum Exporting Countries । (অরগ্যানাইজেশন অব পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রি)

খনিজ তেল উত্তোলক অঞ্চল

খনিজ তেল উত্তোলক দেশ	তৈলখনি
১. সৌদি আরব	ঘাওয়ার, আবকিক, আইনডার, ধাহরান, সাফানিয়া, মনিফা।
২. ইরান	মসজিস-ই-সুলেমান, নফত-ই-শাহ, আঘাজারি, হাফাতকেল, গাচসারন, লালি।
৩. ইরাক	কিরকুক, মাশুল।
৪. কুয়েত	বারগান, মগওয়া-আল হামাদি, আলজারা
৫. সংযুক্ত আরব আমিরশাহি	মুরবান আমিরশাহি
৬. কাতার	জেবেল দুখান, ইদ-আল শারখি।
৭. ওমান	নাতিহ্।
৮. সিরিয়া	ওমর, আল-ইজবা।

এই সমস্ত তেল উত্তোলনকারী দেশগুলোর অর্থনীতি রপ্তানি নির্ভর। খনিজ তেলের মতো মূল্যবান জিনিস উৎপাদন করে এসব দেশে বসবাসকারী মানুষ বিলাসবহুল জীবন যাপন করে।

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার এই দেশগুলোর আবহাওয়া ভীষণ শুষ্ক আর উষ্ণ। একসময় খুব কম লোক বসবাস করত। খনিজ তেলের বিরাট ভাণ্ডার আবিষ্কার হওয়ার পর এখানে বড়ো বড়ো তৈলখনিকেন্দ্রিক শহর গড়ে উঠেছে।

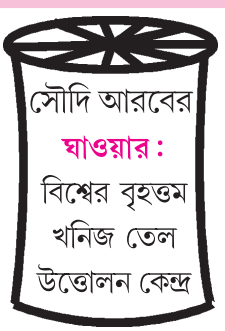

আফ্রিকা : রাজনৈতিক

20° পঃ
0°
20° পূঃ
40°
60° পূঃ
40° উঃ
20° উঃ
0°
20° দঃ
উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর
ই উ রো প
এশিয়া
ভূমধ্যসাগর
লোহিত সাগর
দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
ক্যানারি দ্বীপ
রাবত
মরক্কো
এল আইয়ুন
পশ্চিম সাহারা
আলজিয়ার্স
আলজিরিয়া
তিউনিস
তিউনিসিয়া
ত্রিপোলি
লিবিয়া
কায়রো
মিশর
নৌয়াকছোট
মৌরিতানিয়া
মালি
নাইজার
চাদ
সুদান
খারতুম
ইরিত্রিয়া
আসমারা
জিবৌতি
সেনেগাল
ডাকার
গাম্বিয়া
বানজুল
গিনি বিসাউ
বিসাউ
কোনাক্রি
গিনি
ফ্রিটাউন
সিয়েরা লিওন
মনরোভিয়া
লাইবেরিয়া
বামাকো
বুরকিনা ফাসো
ওয়াগাদোগৌ
নিয়ামে
আইভরি কোস্ট
ইয়ামোসুক্রো
ঘানা
আক্রা
টোগো
লোমে
বেনিন
পোর্তোনোভো
নাইজিরিয়া
আবুজা
এন জামেনা
দক্ষিণ সুদান
জুবা
আদ্দিস আবাবা
ইথিওপিয়া
সোমালি প্রজাতন্ত্র
মোগাদিশু
ক্যামেরুন
ইয়াউন্দে
মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র
বাংগুই
মালাবো
নিরক্ষীয় গিনি
লিব্রেভিলে
কঙ্গো
গ্যাবোন
সাও টোমে ও প্রিন্সিপে
সাও টোমে
ব্রাজাভিল
কিনশাসা
গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো
উগান্ডা
কাম্পালা
কেনিয়া
নাইরোবি
রোয়ান্ডা
কিগালি
বুরুন্ডি
বুজুমবুরা
তানজানিয়া
দোদোমা
লুয়ান্ডা
অ্যাঙ্গোলা
জাম্বিয়া
লুসাকা
মালাউই
লিলোঙ্গো
হারারে
জিম্বাবোয়ে
মোজাম্বিক
মাপুতো
নামিবিয়া
উইনধোক
বোৎসওয়ানা
গ্যাবোরোন
প্রিটোরিয়া
বাবানে
সোয়াজিল্যান্ড
দক্ষিণ আফ্রিকা
মাসেরু
লেসোথো
ভিক্টোরিয়া (সেশেলস)
কোমোরস
মোরোনি
মাদাগাস্কার
আন্তানানারিভো
আফ্রিকা
রাজনৈতিক
দেশের রাজধানী
0 300 600
কিলোমিটার

১০ আফ্রিকা মহাদেশ

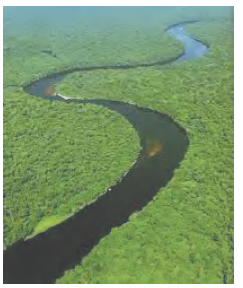

কঙ্গো নদী

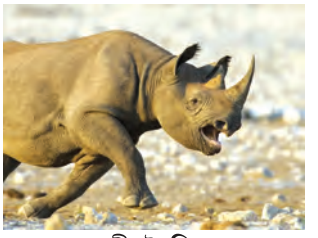

জীববৈচিত্র্য

মিশরের পিরামিড

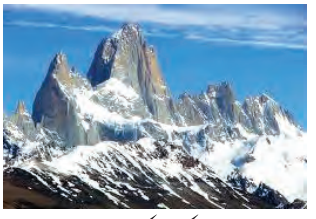

ড্রাকেন্সবার্গ পর্বতমালা

আফ্রিকার ভেল্ড

জনবসতি

নীলনদ

সংস্কৃতি

সাহারা মরুভূমি

মাসাইমারা

সাভানায় সূর্যাস্ত

- আয়তনে এবং জনসংখ্যায় পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ আফ্রিকা, একই সঙ্গে পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম গোলার্ধে অবস্থিত।
- নিরক্ষরেখা, কর্কটক্রান্তিরেখা, মকরক্রান্তিরেখা এবং মূলমধ্যরেখা-চারটিই আফ্রিকার ওপর দিয়ে বিস্তৃত হয়েছে।
- পূর্ব আফ্রিকাতেই পৃথিবীর প্রথম মানুষের উদ্ভব হয়েছিল।
- ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আফ্রিকার বহু দেশ ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার কিছু দেশের উপনিবেশ ছিল।
- ইউরোপ মহাদেশ আর আফ্রিকা মহাদেশের মাঝে আছে জিব্রাল্টার প্রণালী। এশিয়া মহাদেশ আর আফ্রিকার মাঝে আছে লোহিত সাগর ও সুয়েজ খাল। **দুটি বড়ো জলভাগ যেমন সাগর বা মহাসাগর, যুক্ত হয় যে সংকীর্ণ জলভাগ দ্বারা তা হলো প্রণালী।**

আফ্রিকার অবস্থান ও সীমা

- প্রাকৃতিক দুর্গমতা, অস্বস্তিকর উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু, গভীর জঙ্গল ও হিংস্র জন্তুর ভয় ইত্যাদি কারণের জন্য বহুদিন পর্যন্ত এই মহাদেশে আধুনিক সভ্যতার আলো এসে পৌঁছাতে পারেনি, এইজন্য এই মহাদেশকে **অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ** বলা হতো।

আফ্রিকা বন্যপ্রাণ

পিকলুর ডায়েরি

- **আয়তন:** ৩,০২,২১,৫৩২ বর্গ কিমি.
- **সীমা ও বিস্তার:** ৫১°২৪′ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ১৭°৩৩′ পশ্চিম দ্রাঘিমা এবং ৩৭°২০′ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ৩৪°৫২′ দক্ষিণ অক্ষরেখা

  পূর্বে লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তরে ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর।
- **দেশ:** ৫৬টি
- **বিখ্যাত শহর:** কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, ত্রিপলী, খার্টুম ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

ভূমিরূপের বৈচিত্র্য

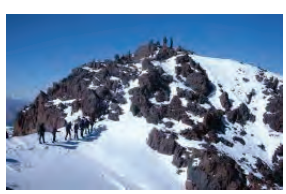
মাউন্ট তৌবকল

আফ্রিকা মহাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রটার দিকে তাকালে একেবারে উত্তর-পশ্চিম দিকে আটলাস পর্বতমালা দেখা যাবে। আটলাস হিমালয় পর্বতমালার মতো উঁচু বা বিশাল নয়। **আটলাস পর্বতমালার সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ হলো মাউন্ট তৌবকল** (৪,১৬৫মি.)।

আটলাস পর্বতমালার দক্ষিণ দিকে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি অঞ্চল— সাহারা। সাহারা মরুভূমির মধ্যভাগে আহাগ্গার ও টিবেস্টি মালভূমি দেখা যায়। অত্যন্ত শুষ্ক ও রুক্ষ হওয়ায় এখানে বসতি প্রায় দেখাই যায় না।

সাহারা মরুভূমি

নীলনদ

সাহারা মরুভূমির পূর্ব প্রান্তে আছে নীলনদ অববাহিকা। এই নদী আফ্রিকার মধ্যভাগের হ্রদ অঞ্চল থেকে বিপুল জলরাশি বয়ে নিয়ে এসে মিশরের মরুঅঞ্চলকে সবুজ করে তুলেছে।

নিরক্ষরেখার আশেপাশে দেখা যায় কঙ্গো নদী অববাহিকার ঘন জঙ্গল। বৃষ্টি বেশি হওয়ায় এই জঙ্গল সারাবছর সবুজ থাকে।

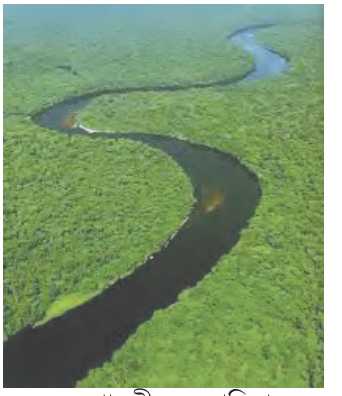

কঙ্গো নদীর অববাহিকা

বৃহৎ গ্রস্ত উপত্যকা

পূর্ব আফ্রিকার ভূ-প্রকৃতি একটু অন্যরকম। ভূ-আলোড়নের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে ফাটল তৈরি হয়েছে। দুটো ফাটলের মাঝের অংশ নীচের দিকে বসে গিয়ে তৈরি করেছে গ্রস্ত উপত্যকা (Great Rift valley)। গ্রস্ত উপত্যকা অঞ্চলে বহু হ্রদ দেখা যায়। হ্রদগুলোর দৈর্ঘ্য ও গভীরতা অনেক বেশি। টাঙ্গানিকা, মালাউই, রুডল্ফ, অ্যালবার্ট এগুলো সবই এইরকম হ্রদ।

পূর্ব আফ্রিকায় গ্রস্ত উপত্যকা অঞ্চল ছাড়াও রয়েছে ইথিওপিয়ার উচ্চভূমি। এই উচ্চভূমি দক্ষিণে মাউন্ট কেনিয়া, মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো এবং রুয়েঞ্জরি পর্বত পর্যন্ত চলে গেছে। **মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো (৫,৮৯৫ মি.) আফ্রিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অবস্থিত হলেও উচ্চতা অনেক বেশি হওয়ায় সারাবছর এর চূড়ায় বরফ জমে থাকে।** কালাহারি আর নামিব নামে দুটি মরুভূমি দক্ষিণ আফ্রিকায় রয়েছে। উঁচু মালভূমিতে যে তৃণাঞ্চল আছে তার নাম **ভেল্ড**। একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রয়েছে ড্রাকেন্সবার্গ পর্বতমালা।

মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো

● আফ্রিকার মানচিত্রে চিহ্নিত করে দেখাও :

আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর, জিব্রাল্টার প্রণালী, নিরক্ষরেখা, কর্কটক্রান্তিরেখা,মকরক্রান্তিরেখা, মূলমধ্যরেখা,আটলাস পর্বতমালা, ড্রাকেন্সবার্গ পর্বতমালা, সাহারা মরুভূমি, আহাগ্গার ও টিবেস্টি মালভূমি, নীলনদ অববাহিকা, মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো, কালাহারি ও নামিব মরুভূমির অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দাও।

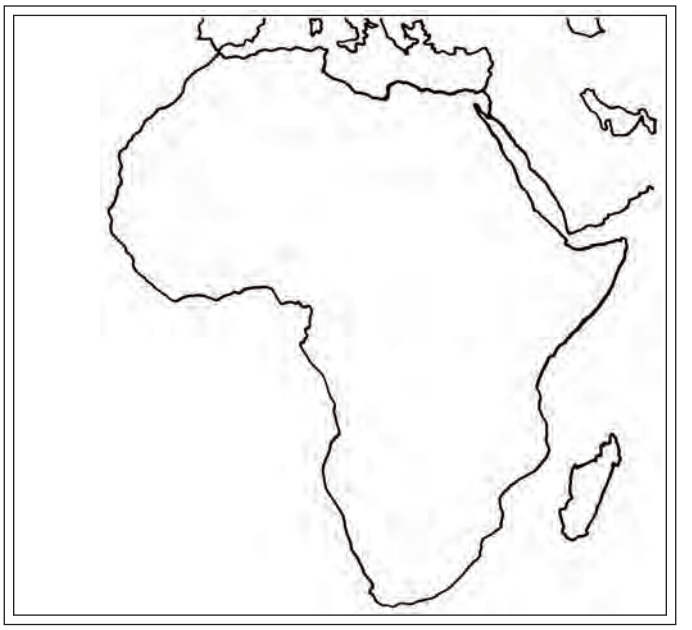

● মেলাও তো দেখি :

(ক)	ভেল্ড	(ক)	আটলাস পর্বতমালা
(খ)	কঙ্গো নদী অববাহিকা	(খ)	দক্ষিণ আফ্রিকার তৃণ অঞ্চল
(গ)	সাহারা	(গ)	দুটি ফাটলের মধ্যবর্তী নীচু অংশ
(ঘ)	মাউন্ট তৌবকল	(ঘ)	ঘন জঙ্গল (চিরসবুজ)
(ঙ)	গ্রস্ত উপত্যকা	(ঙ)	প্রায় বসতিহীন অঞ্চল।

● বলতে পারো কেন?....

৩.১ সাহারা মরুভূমিতে জনবসতি প্রায় দেখাই যায় না।

৩.২ নীলনদ মিশরের মরু অঞ্চলকে সবুজ করে তুলেছে।

৩.৩ কঙ্গো নদীর অববাহিকার ঘন জঙ্গল সারাবছর সবুজ থাকে।

৩.৪ পূর্ব আফ্রিকায় গ্রস্ত উপত্যকা সৃষ্টি হয়েছে।

নদ নদী

আফ্রিকা মহাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রে বহু উচ্চভূমি, মালভূমি ও হ্রদ এলাকা দেখা যায়। এই উচ্চভূমি আর হ্রদগুলোই হচ্ছে আফ্রিকার বড়ো বড়ো নদীর উৎস অঞ্চল। আফ্রিকার পাঁচটা বড়ো নদী হলো —

নদী	দৈর্ঘ্য
(১) নীলনদ	৬৬৫০ কিমি
(২) কঙ্গো নদী	৪৭০০ কিমি
(৩) নাইজার নদী	৪১৮০ কিমি
(৪) জাম্বেসি নদী	৩৫৪০ কিমি
(৫) অরেঞ্জ নদী	২২০০ কিমি

(১) নীলনদ : শুধু আফ্রিকার নয়, সারা পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী নীলনদ। আফ্রিকার মোট জলপ্রবাহের প্রায় ১০ ভাগ জলই নীলনদ দিয়ে বয়ে যায়। দুটো প্রধান ধারা এই নদী তৈরি করেছে। একটা হলো হোয়াইট নীল, যার উৎস আফ্রিকার বিখ্যাত বুরুন্ডি মালভূমি। অন্য ধারাটা হলো ব্লু নীল, যার উৎস ইথিওপিয়ার উচ্চভূমি। উত্তর সুদানের রাজধানী খার্তুম শহর হলো এই দুই ধারার মিলনস্থল। নীলনদ উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে সাহারা মরুভূমির পূর্বপ্রান্তকে করে তুলেছ সবুজ। নীলনদ ভূমধ্যসাগরে, মোহনার কাছে তৈরি করেছে বিশাল ব-দ্বীপ। মিশরের অধিকাংশ মানুষ নীলনদের ধারে কৃষিকাজ, পশুপালন ও বসবাস করে। খার্টুম, আসোয়ান, লাক্সার, কায়রো হলো নীলনদের ধারে গড়ে ওঠা বিখ্যাত শহর।

নীলনদ

(২) কঙ্গো নদী : আফ্রিকার দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। এর প্রবাহের দিক পশ্চিম দিকে। দৈর্ঘ্যে নীলনদের চেয়ে কম হলেও জলপ্রবাহ যথেষ্ট বেশি। আফ্রিকার সবচেয়ে বৃষ্টিবহুল এলাকা থেকে কঙ্গোর সৃষ্টি। প্রতিদিন প্রচুর জল কঙ্গোর মধ্যে দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়ে। বয়ে যাওয়ার পথে বহু জায়গায় গভীর উপত্যকা তৈরি করেছে। জাম্বিয়ার উত্তরপ্রান্ত হলো এই নদীর উৎসস্থল। প্রায় ওই একই জায়গা থেকে পূর্ব দিকে সৃষ্টি হয়েছে জাম্বেসি নদী। কিসাঙ্গানি, বানডাকা, কিনশাসা, ব্রাজাভিল হলো কঙ্গোর তীরে গড়ে ওঠা বড়ো শহর।

(৩) নাইজার নদী : পশ্চিম আফ্রিকার প্রধান নদী। এর উৎসস্থল আটলান্টিক মহাসাগর থেকে মাত্র ২০০ কিমি. দূরে, গিনি উচ্চভূমিতে। মানচিত্রটি দেখলে দেখা যাবে নদীটা আটলান্টিকের উল্টো দিকে সাহারা মরুভূমির দিকে প্রবাহিত হয়েছে। উত্তরদিকে টিমবাক্টু শহর পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার পর আবার দক্ষিণ দিকে এসে নাইজেরিয়ায় প্রবেশ করেছে। মোহনার কাছে ব-দ্বীপ তৈরি করেছে, যা বেশ জনবহুল। এখানে চাষাবাদ, পশুপালন মানুষের জীবিকা। এই নদী ব-দ্বীপের জলাভূমিতে প্রতিবছর পরিযায়ী পাখি উড়ে আসে।

(৪) জাম্বেসি নদী : আফ্রিকার চতুর্থ দীর্ঘতম নদী। জাম্বিয়া, অ্যাঙ্গোলা আর কঙ্গো এই তিনটি দেশের সীমান্ত অঞ্চল থেকেই এই নদীর উৎপত্তি। এই নদীর পথে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত **ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত**। দুটো বড়ো জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে এই নদী পথে।

জাম্বেসি নদী

(৫) অরেঞ্জ নদী : পশ্চিম দিকে প্রবাহিত। আফ্রিকার পঞ্চম দীর্ঘতম নদী। ড্রাকেন্সবার্গ পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে আটলান্টিকে পড়েছে অরেঞ্জ নদী। বেশ কয়েকটা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। জলসেচের উদ্দেশ্যে প্রায় ২৯ টা জলাধার তৈরি করা হয়েছে এই নদীতে।

ঠিক ঠিক লিখে ফেলো...

নদীর নাম	নদীর দৈর্ঘ্য (কিমি)	নদীর উৎস	নদীর মোহনা	নদীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য
নীল নদ				
কঙ্গো নদী				
নাইজার নদী				
জাম্বেসি নদী				
অরেঞ্জ নদী				

আফ্রিকার জলবায়ু

আফ্রিকার ভূমিরূপের বৈচিত্র্য জানা হলো। নদনদীর সম্পর্কেও জানা গেল। এবার জানব এই মহাদেশের জলবায়ু কেমন। এখানকার জলবায়ু সবজায়গায় সমান নয়। সমুদ্রের ধারের জলবায়ু একরকম তো, সমুদ্র থেকে দূরে আরেকরকম। সমভূমিতে একরকম তো পাহাড়ের ওপরে আরেকরকম।

আফ্রিকা মহাদেশে জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈচিত্র্যের কারণ

অক্ষরেখা

নিরক্ষরেখার কাছাকাছি উষ্ণতা বেশি অনুভূত হয়। নিরক্ষরেখা থেকে যত মেরুর দিকে যাওয়া যায়, সূর্যের তির্যক রশ্মির কারণে উষ্ণতা তত কমে যায়।

আফ্রিকার প্রায় মাঝখান দিয়ে নিরক্ষরেখা গেছে। **তাহলে আফ্রিকা মহাদেশের ক্ষেত্রে অক্ষরেখার অবস্থান জলবায়ুর ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলবে?**

সমুদ্র থেকে দূরত্ব

সমুদ্রের পাশের স্থলভূমির উষ্ণতাকে সমুদ্রের বাতাস খুব বাড়তে বা কমতে দেয় না। স্থলভূমি যত সমুদ্র থেকে দূরে হয় সেখানে ঠান্ডা ও গরমের পার্থক্য বাড়ে।

আফ্রিকা মহাদেশের সমুদ্র উপকূল ও উপকূল থেকে দূরে সমুদ্রের প্রভাব কীভাবে পড়বে?

সমুদ্রস্রোত

সমুদ্রের মধ্যে যে বিপুল জলরাশি স্রোতের মতো বয়ে চলে, তা হলো সমুদ্র স্রোত। সমুদ্রস্রোত উষ্ণ বা শীতল দু-ই হতে পারে।

আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দিক দিয়ে উষ্ণ বা শীতল সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হয়। **এইসব উপকূল অঞ্চলে সমুদ্রস্রোতের প্রভাব কী?**

উচ্চতা

উচ্চতা বাড়লে বাতাসের উষ্ণতা কমে যায়। প্রতি ১ কিমি উচ্চতা বাড়লে বাতাসের উষ্ণতা গড়ে ৬.৪° সে. হারে কমে।

আফ্রিকার উঁচু পার্বত্য এলাকায় বাতাসের উষ্ণতার ওপর উচ্চতার প্রভাব কী?

উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুব সহজেই খুঁজে ফেলা যায়।

ভেবে দেখো ....

- একই সময়ে আফ্রিকার উত্তরভাগ আর দক্ষিণ ভাগের জলবায়ু একরকম হয় না কেন?
- আফ্রিকার ক্রান্তীয় অঞ্চলে সাহারার মতো বড়ো মরুভূমির সৃষ্টি হলো কেন?
- আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো পর্বত নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তার চূড়ায় সারাবছর বরফ জমে থাকতে দেখা যায় কেন?

জলবায়ুর সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্ভিদের সম্পর্ক

রফিক গরমের ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিল। পনেরো দিন বাড়িতে তালা। ফিরে দেখে টবের গাছগুলো জল না পেয়ে শুকিয়ে কাঠ। রফিকের চোখ জলে ভরে এল। নিজের হাতে গাছগুলো লাগিয়েছিল। শুধু বেঁচে আছে ক্যাকটাস গাছটা! রফিক বুঝলো জলের অভাবেও কিছু গাছ বাঁচে।

আফ্রিকা মহাদেশের জলবায়ু সব জায়গায় সমান নয়। বিশেষ করে তাপমাত্রা আর বৃষ্টিপাতের ওপর গাছপালা জন্মানো, বেড়ে ওঠা নির্ভর করে। তাপমাত্রা, বৃষ্টির পরিমাণ বদলালে গাছপালার ধরন বদলে যায়। তাহলে দেখা যাক আফ্রিকা মহাদেশে কোথায় কেমন গাছপালা জন্মায়—

১. নিরক্ষীয় চিরসবুজ গাছের অরণ্য : নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে সারাবছর গরম (২৭°সে.), মোট বৃষ্টির পরিমাণ ২০০-২৫০ সেমি.। সরাসরি সূর্যকিরণ আর সারা বছর বৃষ্টিতে এখানে শক্ত কাঠের ঘন জঙ্গল সৃষ্টি হয়েছে। মেহগনি, রোজউড, এবনি এই ঘন জঙ্গলের প্রধান গাছ। পাতা ঝরানোর নির্দিষ্ট ঋতু না থাকায় গাছগুলো সারাবছর সবুজ দেখায়। তাই এর নাম চিরসবুজ গাছের অরণ্য।

মেহগনি গাছ

অ্যাকাসিয়া গাছ

২. সাভানা তৃণভূমি : নিরক্ষীয় অঞ্চলের উত্তরে আর দক্ষিণে বৃষ্টি কমে যেতে থাকে। গরমকালের দৈর্ঘ্য বাড়ে আর বৃষ্টি হয় বছরে ১৫০ সেমির মতো। মরুভূমির দিকে বৃষ্টি কমে ২৫ সেমির মতো হয়ে যায়। মোটামুটি গরম আর কম বৃষ্টির জন্য বড়ো গাছের সংখ্যা কম। তার বদলে লম্বা ঘাসের প্রান্তর চোখে পড়ে। দিগন্ত বিস্তৃত ঘাসজমির মধ্যে অ্যাকাসিয়া আর বাওবাব জাতীয় গাছ দেখা যায়।

৩. ভূমধ্যসাগরীয় উদ্ভিদ : আফ্রিকার একেবারে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু দেখা যায়। এই জলবায়ু অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টি হয়। সারা বছরে ৫০-১০০ সেমি. বৃষ্টি হয়। গরমকাল বৃষ্টিহীন থাকে। পাতায় নরম মোমের আস্তরণ দেখা যায়। জলপাই, ওক, আখরোট, ডুমুর, কর্ক গাছগুলো এখানে জন্মায়। গরমকালে জলের সন্ধানে গাছের মূলগুলো অনেক গভীরে চলে যায়। কমলালেবু, আঙুর এইসব ফলের বাগান খুব চোখে পড়ে।

জলপাই গাছ

মরূদ্যান

৪. উষ্ণমরু উদ্ভিদ : সাহারা, কালাহারি, নামিব এই মরুভূমিগুলোতে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। দিনের তাপমাত্রা ভীষণ বেশি। রাতের তাপমাত্রা সেই তুলনায় অনেক কম। কাঁটাগাছ, ঝোপ-ঝাড়, ঘাস দেখা যায়। গাছগুলো নিজের শরীরে জল ধরে রাখে নানাভাবে। তাই অতি গরমেও গাছগুলো বেঁচে থাকে। মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যান দেখা যায়। মরূদ্যানের ধারে খেজুর, তাল জাতীয় গাছের সারি চোখে পড়ে।

৫. নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি বা ভেল্ড : আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ দিকে কালাহারি মরুভূমি আর ভারত মহাসাগরের ধারে উপকূল অঞ্চলে শীতকালে বেশ ঠান্ডা পড়ে। গরমকালে মোটামুটি গরম। শীত গ্রীষ্মের তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি। এখানে মরু অঞ্চলের থেকে একটু বেশি বৃষ্টি হয়। উঁচু পাহাড়ের ঢালে পপলার, উইলো এই সব গাছ দেখা যায়। সমভূমি এলাকায় ছোটো, খসখসে সবুজ ঘাস দেখা যায়। এই তৃণভূমিকে বলে **ভেল্ড**।

ভেল্ড

৬. মৌসুমি পর্ণমোচী গাছের অরণ্য : আফ্রিকার একেবারে পূর্বদিকে আর মাদাগাস্কার দ্বীপে গরমকালে বৃষ্টি হয়। শীতকাল শুষ্ক থাকে। তবে তাপমাত্রা কোনো ঋতুতেই খুব বেশি নয়। শাল ও বাঁশ গাছের বন জঙ্গল দেখা যায়। শীতকালে জলের অভাবে গাছের পাতা ঝরে যায়।

৭. পূর্ব উপকূলীয় উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ বা চিন দেশীয় উদ্ভিদ : দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল অঞ্চলে গরমকালে বেশ গরম আর বৃষ্টিও হয়। চিন দেশের পূর্বাংশে একই জলবায়ু দেখা যায়, তাই এর নাম চিনদেশীয় জলবায়ু। পাতাঝরা গাছ দেখা যায়। ওক গাছ বেশি চোখে পড়ে।

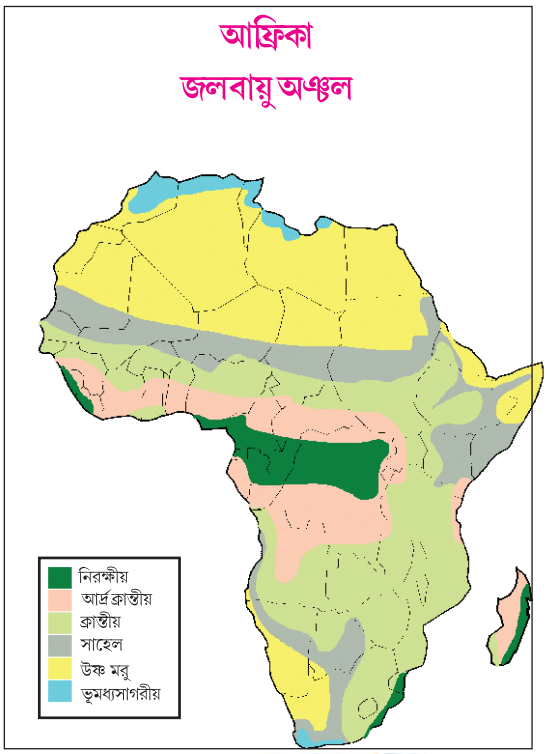

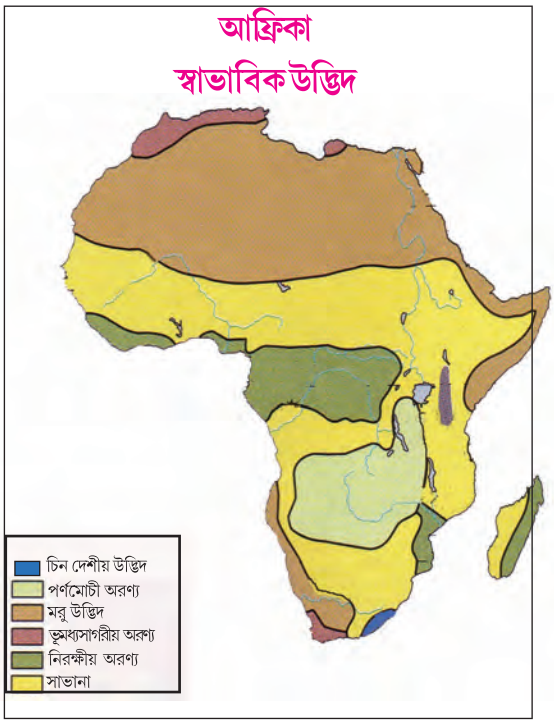

বলোতো দেখি

- কোন গাছ কোন জলবায়ু অঞ্চলে জন্মায়

গাছ বা গাছের ধর্ম	জলবায়ু অঞ্চল
কাঁটাগাছ	
পাতায় মোমের আস্তরণ	
শাল ও বাঁশ গাছ	
জলপাই গাছ	
খসখসে সবুজ ঘাস	
সবুজ ঘাসের সঙ্গে বাওবাব জাতীয় মরু উদ্ভিদ	

- ছোটো ছোটো কাগজে আফ্রিকার ভূ-প্রকৃতি, নদনদী, জলবায়ু আর স্বাভাবিক উদ্ভিদ সম্পর্কে লেখো। যেমন একটা কাগজে লিখলে 'সাহারা'। এরকম আরও টুকরো কাগজে লিখে ফেলো। সবাই একটা একটা করে ভাঁজ করা কাগজ তোলো। খুলে দেখো, তোমার কী বিষয় পড়েছে। দু-মিনিট কিংবা তিন মিনিট সময়ে বিষয়টা নিয়ে যা জান বলো।

নীলনদ অববাহিকা

নীলনদের ধারে গড়ে ওঠা প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার কথা আমরা জানি। সভ্যতা গড়ে ওঠার জন্য জলের জোগান থাকাটা ভীষণ জরুরি। সেই কারণেই প্রাচীন মানব সভ্যতাগুলোর বেশিরভাগই নদীকেন্দ্রিক। নীলনদ অববাহিকা আফ্রিকা মহাদেশের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। মিশর দেশটি নীলনদ দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত। নীলনদ যদি না থাকতো তাহলে মিশর সাহারা মরুভূমির অংশ হয়ে যেত। কৃষি, পশুপালন, জলসেচ, জলবিদ্যুৎ, পরিবহন, শিল্পোন্নতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে নীলনদের অবদান অপরিসীম। এককথায় মিশরের যা কিছু সমৃদ্ধি তা নীলনদের জন্যই। তাই মিশর হলো **নীলনদের দান**।

নীলনদের প্রবাহ পথটা কেমন?

নীলনদের মানচিত্র থেকে বোঝা যায় **নীলনদে** সারাবছর জল থাকে। নীলনদে সারাবছর জলপ্রবাহ কোথা থেকে আসে? নীলনদে বন্যা হয়। **তার কারণ কী?**

হোয়াইট নীলের উৎস	ব্লু নীলের উৎস
↓	↓
বুরুন্ডি মালভূমি ও ভিক্টোরিয়া হ্রদ	ইথিওপিয়ার উচ্চভূমির টানা হ্রদ
↓	↓
নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল	মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল
↓	↓
সারাবছর বৃষ্টি	গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টি
↓	↓
নীলনদে সারাবছর জল	নীলনদে বাড়তি জল

↓

নীলনদের নিম্ন অংশে বন্যা (জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে)

↓

বন্যার ফলে নদীর দুই তীরে নতুন পলিসঞ্চয়

↓

উর্বর কৃষি জমি

নীলনদ অববাহিকা

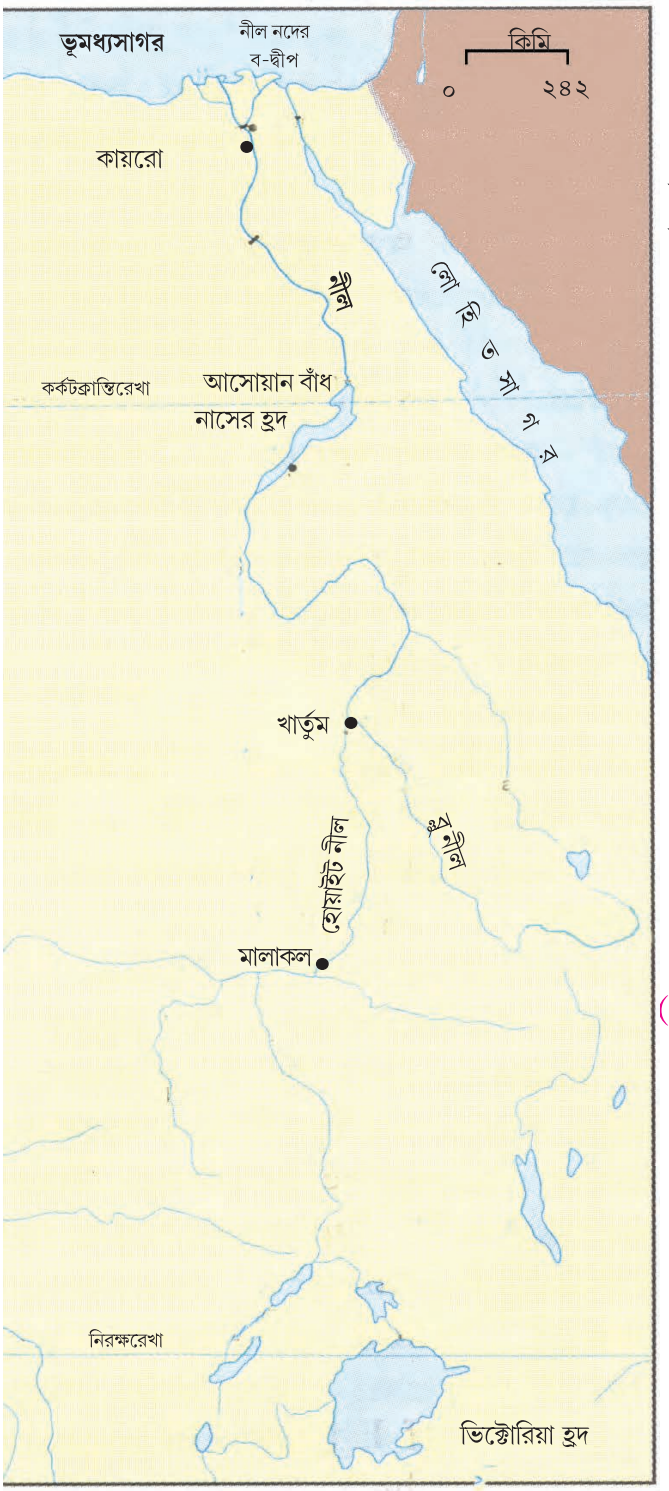

অববাহিকার বিভিন্ন অংশ

(৫) ব-দ্বীপ অঞ্চল

কায়রো থেকে ভূ-মধ্যসাগর। উর্বর পলি সমৃদ্ধ কৃষি এলাকা।

(৪) অববাহিকার নিম্ন অংশ

আসোয়ান থেকে কায়রো। ছ'টি ধাপে নদীটি নেমে গেছে, তৈরি করেছে ছ'টি জলপ্রপাত।

(৩) মধ্য অববাহিকা

মালাকল থেকে খার্তুম। অসমতল, সাভানা তৃণ ভূমি দেখা যায়।

(২) অববাহিকার উচ্চ অংশ

ভিক্টোরিয়া হ্রদ থেকে সুদানের মালাকল শহর।

(১) নদীর উৎস অঞ্চল

তাঞ্জানিয়া দেশের বুরুন্ডি মালভূমি অঞ্চল।

নতুন পলি পড়া উর্বর মাটিতে গম, বার্লি, ধান, আখ, মিলেট প্রভৃতি ফসলের চাষ হয়। নীলনদের ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রচুর লম্বা আঁশের তুলোর চাষ হয়। সারা বিশ্ব জুড়ে যা **ইজিপসিয়ান কটন** নামে খ্যাত।

নীলনদের অববাহিকায় উৎপাদিত ফসল

অঞ্চল	উৎপাদিত ফসল
উচ্চ অববাহিকা	কফি, কলা, তামাক ইত্যাদি
মধ্য অববাহিকা	গম, খেজুর, জোয়ার, চিনেবাদাম ইত্যাদি
নিম্ন অববাহিকা	জলপাই, যব, ভুট্টা ইত্যাদি
ব-দ্বীপ অঞ্চল	ধান, গম, তুলো ইত্যাদি

ইজিপসিয়ান কটন

বন্যার জলের সাথে নতুন পলি এসে মাটিতে মেশে। কিন্তু বন্যার ফলে ঘর-বাড়ি ধসে পড়ে, চাষের জমিতে ফসল নষ্ট হয়। গোরু, ছাগল মারা যায়। সম্পত্তি নষ্ট হয়।

তাহলে বন্যার অতিরিক্ত জলকে আটকাবার জন্য কী উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে?

রাজর্ষি বলল, নদীতে বাঁধ দিয়ে অতিরিক্ত জল আটকে রাখা যেতে পারে। বাঁধের জল প্রয়োজন মতো ছাড়া হয়। রাজর্ষি মাইথন জলাধার (Dam) দেখেছে। পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড সীমান্তে বরাকর নদীতে বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। নীলনদের ওপরও মিশরীয়রা বাঁধ তৈরি করেছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও কৃষি জমিতে জলসেচ এই দুটি মূল উদ্দেশ্যে নীলনদের ওপর আসোয়ান বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। তবে নদী বাঁধ নির্মাণের আরও অনেক উদ্দেশ্য থাকে। যখন বহু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নদীতে বাঁধ তৈরি করা হয় তখন তাকে বলে **বহুমুখী নদী পরিকল্পনা**। নীলনদের ওপর এরকম অনেক **নদী পরিকল্পনা** করা হয়েছে।

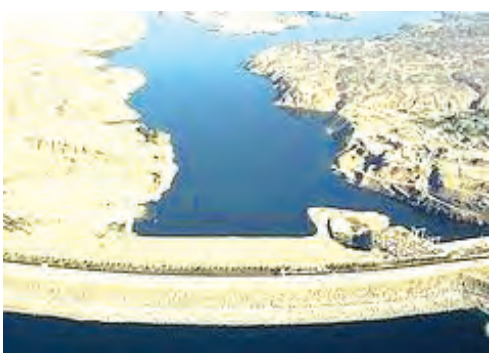

আসোয়ন বাঁধ

পৃথিবীর বৃহত্তম বাঁধ → **উচ্চ আসোয়ান বাঁধ** (মিশর)। ব্লু নীলের ওপর তৈরি হয়েছে **জেবেল-আউলিয়া** বাঁধ। সুদানে ব্লু নীলের ওপর দেওয়া আছে **সেনার** ও **আটাবারা** বাঁধ। মিশরে আরও কতকগুলো বিখ্যাত বাঁধ হলো **লেক নাসের বাঁধ, নাগ হামাদি, ইসনা, অ্যাসিউট**।

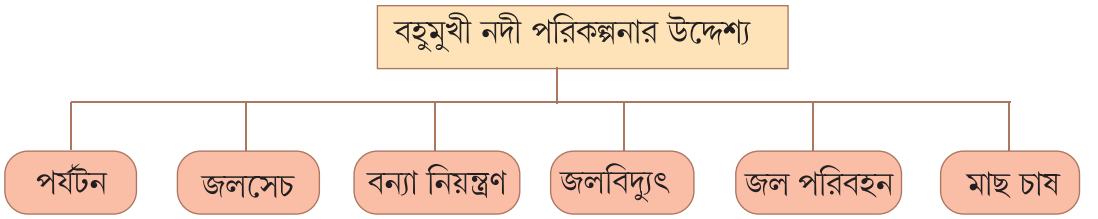

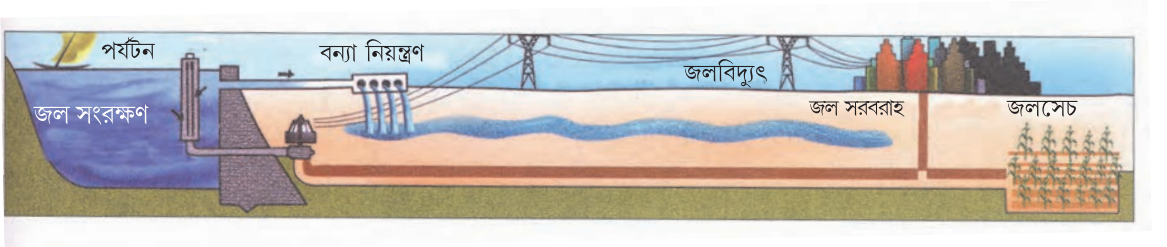

- নীলনদের অববাহিকা খনিজ সম্পদে তেমন সমৃদ্ধ নয়। তবে কিছু পরিমাণে খনিজ সম্পদ, যেমন- ম্যাঙ্গানিজ, ফসফেট্স, আকরিক লোহা, খনিজ লবণ ইত্যাদি মিশর এবং সুদান থেকে পাওয়া যায়।

- নীলনদের অববাহিকায় উপযুক্ত পরিমাণে জলের জোগান কাঁচামালের সহজলভ্যতা, প্রচুর শ্রমিক সুলভ জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি কারণে মিশর ও সুদানে বেশ কিছু শিল্প গড়ে উঠেছে। যেমন- বস্ত্রবয়ন, পশম, সিমেন্ট, মোটর গাড়ি ইত্যাদি।

জেনে রাখো

- নীলনদের ধারে কৃষি, শিল্প, যাতায়াত ব্যবস্থা এতটাই উন্নত যে মিশরের বেশির ভাগ মানুষ (৮০%) এখানেই বসবাস করে। বাকিরা আশপাশের মরু অঞ্চলের মরূদ্যান (Oasis) গুলোর ধারে ঘর-বাড়ি বানিয়ে থাকে।

- নীলনদের নিম্ন অববাহিকায় কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, পোর্ট-সৈয়দ, পোর্ট সুয়েজ ইত্যাদি বিখ্যাত শহর গড়ে উঠেছে।

মিশরের রাজধানী কায়রো এখানকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর, শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র।

আলেকজান্দ্রিয়া

নীলনদের অববাহিকা অঞ্চলে মানুষের জীবনে নীলনদের প্রভাব সম্পর্কে আরো তথ্য সংগ্রহ করে সুনির্দিষ্ট ধারণা তৈরি করো।

পৃথিবীর বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি

সাহারা

পৃথিবীর বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি হলো আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি। সাহারা মরুভূমি এতটাই বড়ো যে একটা গোটা ইউরোপ মহাদেশ বা আড়াইখানা ভারতবর্ষ ঢুকে পড়তে পারে সেখানে। পাথুরে পাহাড়, বাতাসের আঁকিবুকি কাটা দিগন্ত বিস্তৃত ধু ধু বালির প্রান্তর, উটের দল নিয়ে হেঁটে চলা যাযাবরের জীবনকথা, মরূদ্যান, মাঝে মাঝে কাঁটা গাছ—এই হলো সাহারা।

সাহারা মরুভূমির সীমা

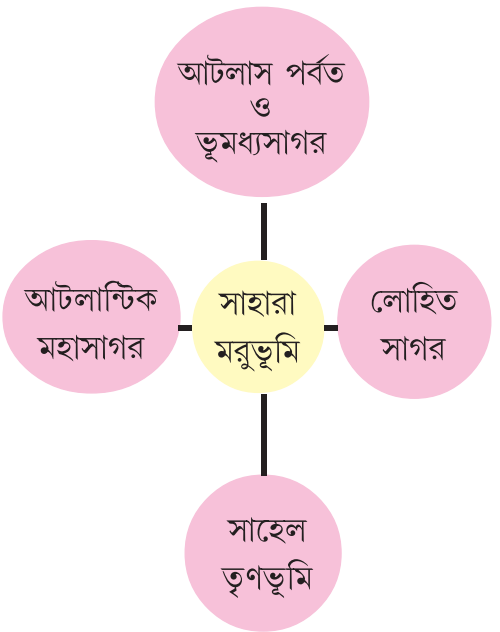

সাহারার ভূমিরূপ

উচ্চতা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাহারা মরুভূমি একটি মালভূমি অঞ্চল। প্রাচীন শিলা দ্বারা গঠিত ও বহুদিন ধরে ক্ষয় পাওয়া আহাগ্গর ও টিবেস্টি মালভূমি অপেক্ষাকৃত উঁচু। বাতাস দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হয়। গাছপালাহীন প্রান্তরে বাতাস পাথরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে নানা নকশা তৈরি করে।

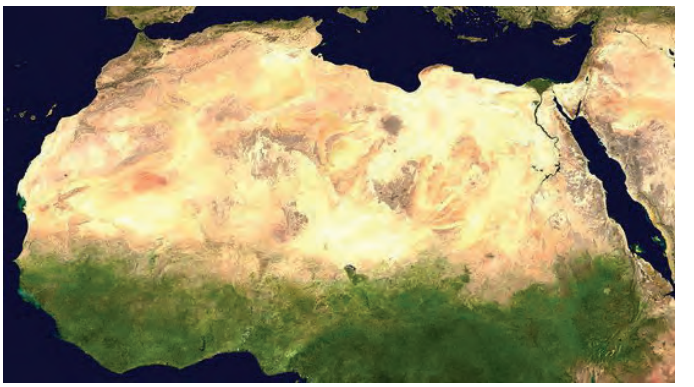

সাহারা মরুভূমির ভূমিরূপ

আর্গ

যে সব অঞ্চলে বালির স্তূপ জমা হয়ে ছোটো পাহাড়ের মতো তৈরি করে তা হলো—**আর্গ**।

হামাদা

যে সব অঞ্চল শক্ত পাথরে ভরতি, বালির অস্তিত্ব চোখেই পড়ে না, তা হলো—**হামাদা**।

ওয়াদি

সাহারার বেশিরভাগ নদীগুলো আটলাস পর্বত ও মধ্য ভাগের উচ্চভূমি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তবে নদীগুলো বেশিরভাগই শুকনো। শুকনো নদীর খাতগুলো হলো—**ওয়াদি**।

রেগ

যে সব অঞ্চলে বালির সঙ্গে পাথরের টুকরো একসঙ্গে মিশে থাকে তা হলো—**রেগ**।

সাহারা মরুভূমিতে বহু মরূদ্যান দেখা যায়। কুফরা, সিউয়া, টিমিমন, ঘারজাইয়া, বাহারিয়া—সাহারার উল্লেখযোগ্য মরূদ্যান।

মরূদ্যান

সাহারার জলবায়ু

দিনের বেলা : ভীষণ গরম আর বাতাসে জলীয়বাষ্প থাকে না। তাপমাত্রা মাঝে মাঝে ৫৮°সে. পর্যন্ত হয়ে যায়।

রাতের বেলা : বেশ ঠান্ডা। তাপমাত্রা নেমে যায় ৪°সে। রাত ও দিনের তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত বেশি হওয়া সত্ত্বেও মানুষ নিজেকে মানিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকে।

গরমকালে সাহারা মরুভূমি থেকে একপ্রকার গরম আর শুকনো বাতাস বয়ে যায়। স্থানীয় ভাষায় একে **খামসিন** নামে ডাকা হয়। গিনি উপকূল অঞ্চলে খামসিনকে বলে **হারমাটান**।

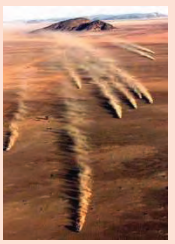

গরমকালে দিনের বেলায় কখনো কখনো প্রবল বালির ঝড় হতে দেখা যায়। তাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় **সাইমুম**।

লিবিয়ার আল আজিজিয়ার (ত্রিপোলির দক্ষিণে) তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি।

গাছপালা : ক্যাকটাস জাতীয় গাছ দেখা যায়। তবে মরূদ্যানের আশেপাশে ঘাস, খেজুর প্রভৃতি গাছ জন্মাতে দেখা যায়। মরূদ্যানে সামান্য জলের জোগানে ভুট্টা, জোয়ার, বাজরার চাষ হয়। মরূদ্যানের ধারে যারা চাষবাস করে আর যারা মরুভূমিতে পশুর দল, বিশেষত উট নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় জল ও খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় তাদের বলে— **যাযাবর।**

যাযাবর গোষ্ঠী

যাযাবরের খাদ্য : যাযাবরেরা উটের দল, ঘোড়া, ছাগল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। পশুর দুধ ও মাংস এদের প্রধান খাদ্য।

সাহারার সম্পদ : **খনিজ তেল** ও **প্রাকৃতিক গ্যাস** পাওয়া যায় **লিবিয়াতে, আলজেরিয়াতে।** এছাড়া **লবণ, কয়লা, আকরিক লোহাও** পাওয়া যায়। তবে অত্যধিক গরমের কারণে এখানে খনিজ সম্পদ আহরণ করাই কষ্টসাধ্য।

উট সাহারার অধিবাসীদের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম। মরুভূমিতে দল বেঁধে যখন উট চলে তখন তাকে **ক্যারাভান** বলে। তবে বর্তমানে পাকা রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। খনি অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বিমানবন্দরও তৈরি করা হয়েছে।

সময়ের সাথে সাথে সাহারা

পশুপালক যাযাবর

সময়ের সাথে সাথে সাহারা পাল্টাচ্ছে। জায়গায় জায়গায় ঘাস লাগানো হয়েছে। অত্যন্ত চওড়া পাকা রাস্তা পুরোনো উট চলা রাস্তার ওপর দিয়ে চলে গেছে। উঁচু বাড়ি, মসজিদ তৈরি হয়েছে। উটের বদলে ট্রাকের দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে। সাহারার **তুয়ারেগ** জাতির মানুষেরা বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণ নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন পশুপালক যাযাবরেরা এখন খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন কেন্দ্রগুলোতে কাজ করে। এরা এখন স্থায়ী ভাবে শহরে বসবাস করে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও সাহারা

পৃথিবী ক্রমশ উষ্ণ হচ্ছে! কিন্তু পৃথিবীর উষ্ণ হওয়ার জন্য সাহারার কী পরিবর্তন হচ্ছে? আমাদের ভাবনায় এটাই আসে যে সাহারায় আরও গরম বাড়ছে! সাহারা মরুর আরও বিস্তার হচ্ছে ! ঢুকে পড়ছে আশপাশের বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে, গ্রাস করে নিচ্ছে আফ্রিকার সবুজকে! **কিন্তু সত্যিই কি তাই?**

সাহারা মরুভূমিতে পাথরের ওপর কিছু উদ্ভিদ ও জলজ প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, যা থেকে বোঝা যায় সাহারা কোনো এক সময় বৃষ্টিবহুল অঞ্চল ছিল। তাহলে কী করে সেই জায়গায় তৈরি হলো মরুভূমি? জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফলেই সাহারা গাছপালাযুক্ত ঘন সবুজের জঙ্গল থেকে ধীরে ধীরে শুষ্ক, বৃষ্টিহীন অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু এখন আবার সাহারায় বৃষ্টি বাড়ছে—সবুজ বাড়ছে। কৃষিজমি দেখা যাচ্ছে, পশুপালন হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন সাহারাকে হয়তো ভবিষ্যতে আবার করে তুলবে শস্য শ্যামল।

হাতে কলমে

বিশ্ব উষ্ণায়ন সাহারা মরুভূমি ছাড়াও পৃথিবীর অন্য অঞ্চলে কী কী পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে, সে সম্পর্কে জানার চেষ্টা করো।

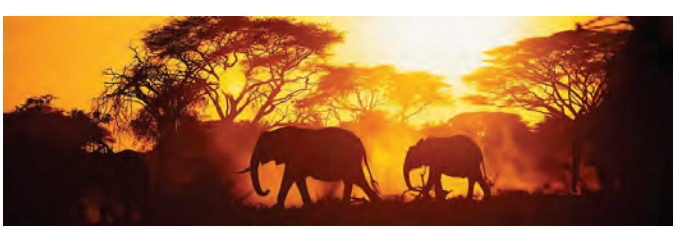

ইউরোপ রাজনৈতিক

ইউরোপ
রাজনৈতিক
দেশের রাজধানী
আর্কটিক মহাসাগর
আটলান্টিক মহাসাগর
নরওয়েজীয় সাগর
উত্তর সাগর
শ্বেত সাগর
বাল্টিক সাগর
বিস্কে উপসাগর
ইংলিশ চ্যানেল
জিব্রালটার প্রণালী
ভূমধ্য সাগর
কৃষ্ণ সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
এজিয়ান সাগর
এশিয়া
আফ্রিকা
রাশিয়া
মস্কো
ফিনল্যান্ড
হেলসিংকি
সুইডেন
স্টকহোম
নরওয়ে
অসলো
ডেনমার্ক
কোপেনহেগেন
এস্তোনিয়া
লাটভিয়া
রিগা
লিথুয়ানিয়া
ভিলনিয়াস
বেলারুশ
মিনস্ক
ইউক্রেন
কিয়েভ
মলডোভা
চিসিনাউ
রোমানিয়া
বুখারেস্ট
বুলগেরিয়া
সোফিয়া
তুরস্ক
গ্রীস
এথেন্স
ক্রীট
পোল্যান্ড
ওয়ারসা
জার্মানি
বার্লিন
চেক প্রজাতন্ত্র
প্রাগ
স্লোভাকিয়া
ব্রাতিস্লাভা
হাঙ্গেরি
বুদাপেস্ট
অস্ট্রিয়া
ভিয়েনা
সুইজারল্যান্ড
বার্ন
ইতালি
রোম
সিসিলি
সার্ডিনিয়া
কর্সিকা
মাল্টা
ভালেটা
ফ্রান্স
প্যারিস
লুক্সেমবার্গ
বেলজিয়াম
ব্রাসেলস
নেদারল্যান্ডস
আমস্টারডাম
যুক্তরাজ্য
লন্ডন
আয়ারল্যান্ড
ডাবলিন
আইসল্যান্ড
রেইকজাভিক
ফারো দ্বীপপুঞ্জ
(ডেনমার্ক)
স্পেন
মাদ্রিদ
পর্তুগাল
লিসবন
আলবেনিয়া
তিরানা
সার্বিয়া
বেলগ্রেড
ক্রোয়েশিয়া
জাগ্রেব
স্লোভেনিয়া
বসনিয়া
মন্টিনিগ্রো
ম্যাসিডোনিয়া
স্কোপিয়া
আন্দোরা
ইউরোপ

১১ ইউরোপ মহাদেশ

শিল্প বিপ্লব

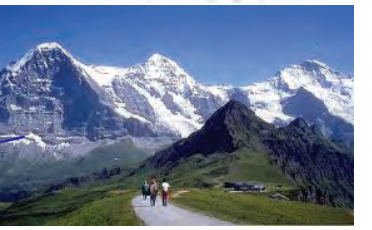

আল্পস পর্বতমালা

পিসার মিনার

সমৃদ্ধশালী ইউরোপ

আইফেল টাওয়ার

পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম মহাদেশ ইউরোপ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি, কৃষি-শিল্প, প্রযুক্তি-গবেষণায় অত্যন্ত উন্নত এবং সমৃদ্ধ।

- ষোড়শ শতাব্দীতে এই মহাদেশের উৎসাহী নাবিকদের ভৌগোলিক অভিযানের কারণেই পৃথিবীর অজানা, অচেনা অনেক দেশ-মহাদেশের সন্ধান পাওয়া যায়।
- শিল্প বিপ্লব এবং আধুনিক যন্ত্র-নির্ভর সভ্যতার বিকাশ এই মহাদেশেই প্রথম হয়েছিল।
- এই মহাদেশের বেশ কিছু দেশ (ইংল্যান্ড, পোর্তুগাল, স্পেন, হল্যান্ড, ফ্রান্স) থেকে সারা পৃথিবীতে বাণিজ্য-অভিযান হয়েছিল। ফলে এক সময়ে পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশ এই দেশগুলির উপনিবেশ ছিল।

পিকলুর ডায়েরি

- **আয়তন:** ১ কোটি ৯ লক্ষ বর্গ কিমি.
- **অবস্থান ও সীমা:** ৩৫° উ: অক্ষাংশ— ৭১° উ: অক্ষাংশ এবং ২৪° প: দ্রাঘিমা—৬৫°পূ: দ্রাঘিমা ।

পূর্বে এশিয়া ও কাস্পিয়ান সাগর, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, বিস্কে উপসাগর, উত্তর সাগর, উত্তরে সুমেরু মহাসাগর, শ্বেত সাগর, বাল্টিক সাগর এবং দক্ষিণে জিব্রাল্টার প্রণালী, ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণ সাগর।

- **দেশের সংখ্যা :** ৫৪ টি
- **বিখ্যাত শহর:** লন্ডন, প্যারিস আমস্টারডাম, মাদ্রিদ, রোম, বার্লিন।

ইউরোপ মহাদেশের সমৃদ্ধির কারণ

- উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান—সব মহাদেশের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা।
- তিনদিকে জলভাগ—সমভাবাপন্ন নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, অধিবাসীরা কর্মঠ, পরিশ্রমী।
- উষ্ণ উপসাগরীয় সমুদ্রস্রোত-উত্তর পশ্চিমের বন্দর গুলো বরফ মুক্ত থাকে।
- সরলবর্গীয় বনভূমির প্রাচুর্য—নরমকাঠ, কাগজ ও কাষ্ঠ শিল্পে উন্নতি।
- খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য, জলবিদ্যুৎ, পারমাণবিক বিদ্যুৎ, উন্নত যোগাযোগ, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য—পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শিল্পোন্নত মহাদেশ।
- বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য আহরণ, উন্নত কৃষি ব্যবস্থা, মিশ্র কৃষি, খাদ্য শস্য ও পশুপালন।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

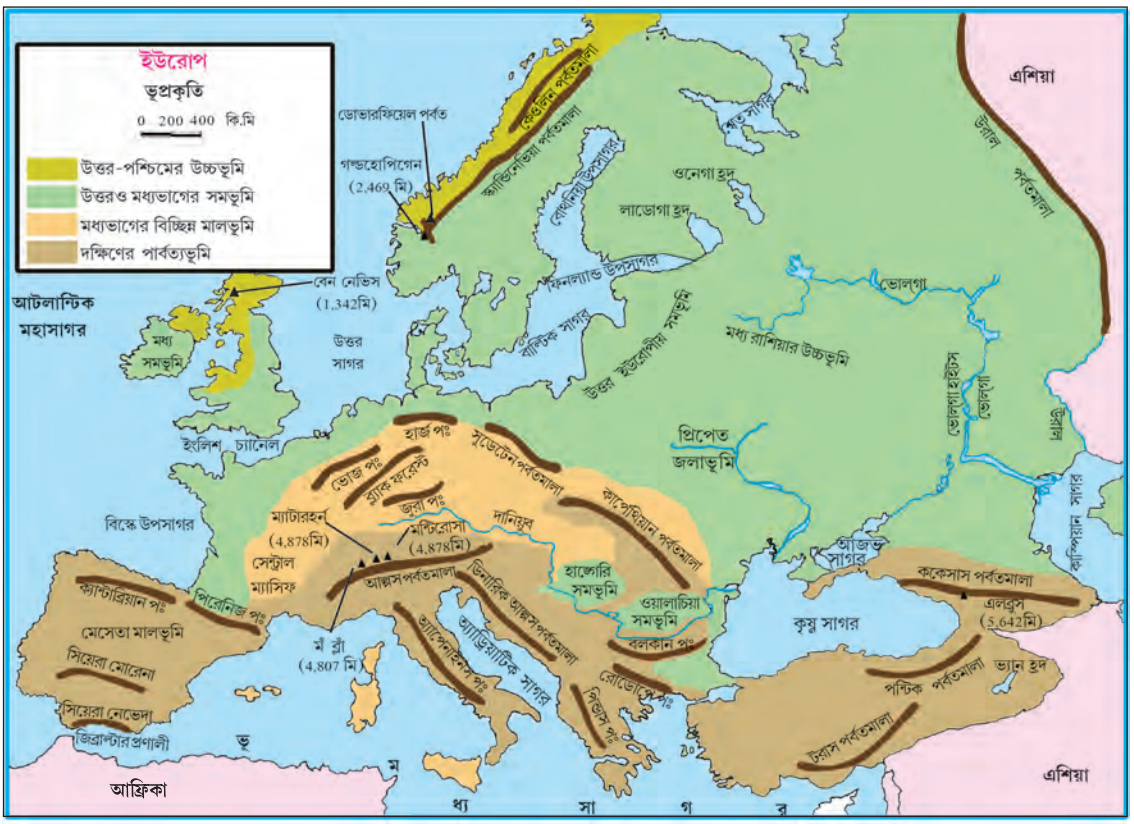

ইউরোপ মহাদেশ আয়তনে ছোটো হলেও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কোনো অভাব নেই। দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল থেকে উত্তরে উত্তর সাগরের তীরভূমি এবং পূর্বে ইউরাল পর্বত থেকে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রান্তে তুষার ঢাকা পর্বত, বিস্তৃত সমভূমি, গভীর পাইনের বন ছড়িয়ে রয়েছে। ইউরোপের বেশির ভাগ অঞ্চল সমভূমি হলেও উঁচু মালভূমি, নীচু ভূমি,পর্বতময় অঞ্চলও রয়েছে।

● দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলের মাঝে রয়েছে আল্পস পর্বতশ্রেণি। আল্পসের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মঁ-ব্লাঁ (৪৮০৭ মি.) ফ্রান্স-সুইজারল্যান্ড সীমান্তে অবস্থিত। আল্পস থেকে শিরার মতো বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়েছে পিরেনিজ (ফ্রান্স-স্পেন সীমান্তে) সিয়েরা নেভেদা, ক্যান্টাব্রিয়ান (স্পেন), অ্যাপেনাইন (ইতালি), ডিনারিক আল্পস (সার্বিয়া, আলবানিয়া), পিন্ডাস (গ্রিস), রোডপ (বুলগেরিয়া, টার্কি), বলকান, ককেশাস, বোহেমিয়া প্রভৃতি পর্বতশ্রেণি। **ককেশাস পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এলবুর্জ (৫৬৪২ মি.) ইউরোপের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।**

● বহু নদীর উৎপত্তি হয়েছে এই আল্পস পার্বত্য অঞ্চলে। এদের মধ্যে রোন, পো, দানিয়ুব ইত্যাদি নদী দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। অপরদিকে সীন, রাইন, এলব প্রভৃতি নদী আল্পসের উত্তরের মালভূমি অঞ্চলকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে উত্তরের বিশাল সমভূমি অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। স্পেনের মেসেতা, ফ্রান্সের সেন্ট্রাল ম্যাসিফ, রাশিয়ার ডন ম্যাসিফ এইরকম

ভেবে লেখো

যেখান থেকে অনেকগুলো পর্বতমালা চারিদিকে প্রসারিত হয় তাকে কী বলে?

বিচ্ছিন্ন মালভূমির উদাহরণ। পূর্বে ইউরাল পর্বত থেকে শুরু হয়ে উত্তরের বিশাল সমভূমি রাশিয়া, বেলজিয়াম, পোল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ডের মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে শেষ হয়েছে। এখানকার গড় উচ্চতা ১৮০ মি.।

জানো কী?
ইউরোপের ফিনল্যান্ডে প্রায় ৩৫ হাজারের বেশি হ্রদ থাকার জন্য একে হাজার হ্রদের দেশ বলা হয়।

- পূর্বে ভলডাই (৩০৫ মি.) ও অন্যান্য পাহাড়ি অঞ্চলের উচ্চতা কিছুটা বেশি। এই ভলডাই পাহাড়ি অঞ্চলেই উৎপন্ন হয়েছে ভল্গা, ডন, নিপার প্রভৃতি নদী। এই সমভূমির অনেক জায়গায় আবার হিমবাহের ক্ষয়ের ফলে বা ভূমি ধসের ফলে বড়ো বড়ো হ্রদ তৈরি হয়েছে। যেমন—**ল্যাডোগা (১৮,১৩০ বর্গ কিমি) ইউরোপের বৃহত্তম হ্রদ**। এই সমভূমির উত্তর-পশ্চিমে নেদারল্যান্ডে সমুদ্রের অগভীর এলাকা ভরাট করে তৈরি করা হয়েছে **পোল্ডারভূমি**।

- ইউরোপের উত্তর পশ্চিমে ফিনল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে ও আইসল্যান্ডে,প্রাচীন পার্বত্য অঞ্চল দেখা যায়। নরওয়ের ডোভারফেল, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের গ্রাম্পিয়ান এখানকার উল্লেখযোগ্য পর্বত।

- ইউরোপের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে (ইতালির ভিসুভিয়াস, সিসিলি দ্বীপের এটনা, লিপারি দ্বীপের স্ট্রম্বলি) এবং আইসল্যান্ডে (ক্র্যাফলা, হেকলা) বেশ কয়েকটি আগ্নেয়গিরি দেখা যায়।

স্ট্রম্বলি : ভূমধ্যসাগরের 'আলোকস্তম্ভ'

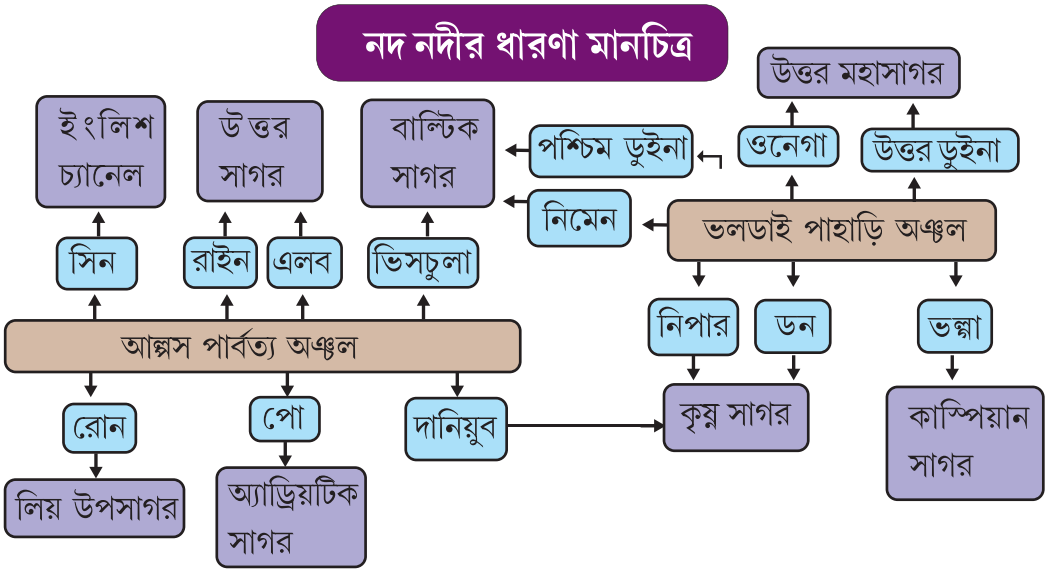

ধারণা মানচিত্র থেকে ঠিক ঠিক লিখে ফেলো

নদীর নাম	উৎস	মোহনা	উপনদীর নাম	বিশেষ বৈশিষ্ট্য
সিন	?	?	ওইস, মারনে	ফ্রান্সের দীর্ঘতম নদী
এলব	?	?	হাভেন, অরজু	
রাইন	?	?	রূঢ়, নিপে	ইউরোপের ব্যস্ততম অভ্যন্তরীণ জলপথ
ভিসচুলা	?	?	রুডা, নিডা, চেক	পোল্যান্ডের দীর্ঘতম নদী
রোন	?	?	আইন	
পো	?	?	টিসিনো	ইতালির দীর্ঘতম নদী
দানিয়ুব	ব্ল্যাক ফরেস্ট পর্বত	?	দ্রাভা, সাভা	শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক নদী
ভল্গা	?	?	ওকা, কামা	ইউরোপের দীর্ঘতম
নিপার	?	কৃষ্ণ সাগর	বস	

ইউরোপের ভূমিরূপের সাধারণ ঢাল কোন দিকে বলে মনে হয় এবং কেন?

জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ

সাধারণভাবে ইউরোপের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতির। যদিও অঞ্চলভেদে বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। প্রায় সারাবছরই এই মহাদেশের কোনো না কোনো অংশে বৃষ্টিপাত হয়। অক্ষাংশগত কারণে আবার দক্ষিণ

থেকে উত্তরে উষ্ণতা ক্রমশ কমতে থাকে। গ্রীষ্মকালে যখন দক্ষিণ-পূর্বাংশে উষ্ণতা থাকে গড়ে ২৭° সে., তখন উত্তর সীমানায় উষ্ণতা হয় ১৪° সে.। এই সময় বায়ুচাপ বলয়গুলি উত্তরে সরে যায় বলে দক্ষিণ ইউরোপে শুষ্ক উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু এবং বাকি অঞ্চলে আর্দ্র পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হয়। শীতকালে উষ্ণ উত্তর আটলান্টিক স্রোতের প্রভাবে পশ্চিমাংশের উষ্ণতা ১০° সে. থাকলেও মধ্য-পূর্বাংশে তা যথেষ্ট কমে যায়। আর উত্তর-পূর্ব সীমান্তে তা আরও কমে হিমাঙ্কের অনেক নীচে (-১৪° সে.) নেমে যায়।

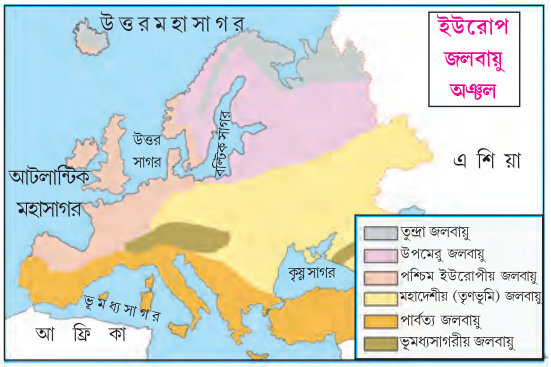

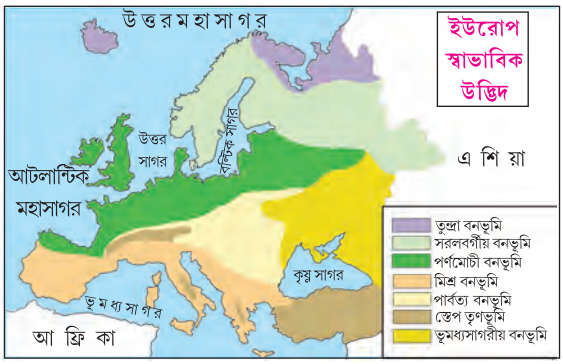

দুটো মানচিত্রের মধ্যে কি কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছো ?

উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের আঞ্চলিক তারতম্যের ভিত্তিতে ইউরোপকে বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করা যায়। স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য প্রধানত জলবায়ু নির্ভর। তাই উদ্ভিদ অঞ্চল এবং জলবায়ু অঞ্চলের সীমারেখার মধ্যে মিল পাওয়া যায়।

১. তুন্দ্রা জলবায়ু -তুন্দ্রা উদ্ভিদ : ইউরোপের উত্তরাংশে নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও রাশিয়ার উত্তরাংশে বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রায় সারাবছর তীব্র শীতল আবহাওয়া ও তুষার পাতের কারণে ভূমি ৯-১০ মাস বরফাবৃত থাকে। গ্রীষ্মকালে যখন ২-৩ মাস ভূমি বরফমুক্ত থাকে তখন মস, লিচেন ইত্যাদি নানা ধরনের ছোটো ফুলের গাছ জন্মায়।

২. উপমেরু জলবায়ু-সরলবর্গীয় অরণ্য : সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে ও রাশিয়ার কিছু অংশে এই জলবায়ু লক্ষ করা যায়। এখানেও ভূমি ৬-৮ মাস বরফে ঢাকা থাকে। গ্রীষ্মকালে অল্প বৃষ্টিপাত, শীতকালে তুষারপাত এখানকার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। এই পরিবেশে পাইন, লার্চ, ফার, বার্চ, অল্ডার প্রভৃতি নরম কাঠের সরলবর্গীয় বনভূমি এখানে গড়ে উঠেছে। এই বনভূমি পূর্বদিকে প্রসারিত হয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম তৈগা বনভূমিতে মিশেছে। এখানে গ্রীষ্মকালে ৪-৫ মাস তাপমাত্রা থাকে ১০° সে. । আর শীতকালে ৭-৮ মাস তাপমাত্রা -২৫° সে. থেকে -৩৫° সে. হয়ে যায়।

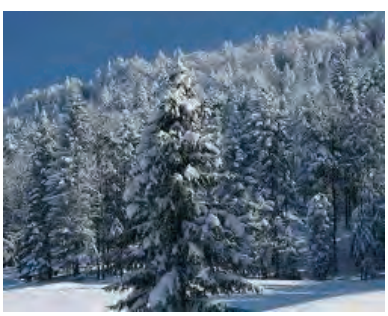

৩.পশ্চিম ইউরোপীয় জলবায়ু-নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী অরণ্য: উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, পশ্চিম ফ্রান্স, জার্মানির পশ্চিমাংশ, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম এবং নরওয়ের কিছু অংশে এই জলবায়ু দেখা যায়। এখনকার অরণ্যে নরমকাঠের সরলবর্গীয় গাছের সঙ্গে শক্ত কাঠের পর্ণমোচী গাছ পাশাপাশি জন্মায়। ওক, ম্যাপল, অল্ডার, উইলো প্রভৃতি গাছ এখানে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা থাকে ১৫° - ২০° সে. এবং শীতকালও বেশ শীতল (৫° সে.)। সারাবছর বৃষ্টি হয়, তবে শীতকালে এর পরিমাণ বেশি (বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০০-১৫০ সেমি.)।

৪. ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু-ভূমধ্যসাগরীয় অরণ্য : ইউরোপের দক্ষিণাংশে ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স, গ্রিস প্রভৃতি দেশের ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল অঞ্চলে এই জলবায়ু দেখা যায়, এখানে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। জলপাই, ডুমুর, কর্ক, ওক, সিডার প্রভৃতি গাছ দেখা যায়। আঙুর ও কমলালেবু এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। গ্রীষ্মকালীন উষ্ণতা ২১°-২৭° সে. এবং শীতকালীন উষ্ণতা ৫°-১০° সে. । বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০-৭৫ সেমি।

৫. মহাদেশীয় জলবায়ু-স্টেপ তৃণভূমি : ইউরোপের মধ্য ও পূর্বাংশে রাশিয়া ও ইউক্রেনে এই জলবায়ু দেখা যায়। এখানে বৃষ্টিপাত কম হয় বলে তৃণভূমি তৈরি হয়েছে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের এই তৃণভূমি **'স্টেপ'** নামে পরিচিত। তবে নদীর ধারে যেখানে জল বেশি পাওয়া যায় সেখানে উইলো, এলম, ম্যাপল প্রভৃতি গাছ জন্মাতে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালীন উষ্ণতা ২০°-২২° সে. এবং শীতকালে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে থাকে। বৃষ্টিপাত ২৫-৫০ সেমি.। বর্তমানে স্টেপ অঞ্চলের বেশিরভাগ স্থান পরিষ্কার করে কৃষিকাজ করা হচ্ছে।

★ **ইউরোপের কোন জলবায়ু অঞ্চলে জনবসতি সবচেয়ে বেশি এবং কোন জলবায়ু অঞ্চলে সবচেয়ে কম হতে পারে বলে তোমার মনে হয় ?**

রূঢ় শিল্পাঞ্চল

জার্মানির রাইন ও তার দুই উপনদী রূঢ় ও লিপের সংযোগস্থলে কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল, **'রূঢ় শিল্পাঞ্চল'**।

এই শিল্পাঞ্চলের উত্তরে লিপে নদী, দক্ষিণে রূঢ় ও পশ্চিমে রাইন নদী প্রবাহিত হয়েছে। আর পূর্ব সীমানায় রয়েছে সয়ারল্যান্ড উচ্চভূমি।

অঞ্চলটির আয়তন প্রায় ৪,৬০০ বর্গ কিমি।।

রূঢ় শিল্পাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ

- হিমবাহ ও নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে এই অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে। ভূপ্রকৃতি সামান্য ঢেউ খেলানো। হিমবাহের সঞ্চয় কার্যের ফলে ছোটো ছোটো টিলা দেখা যায়। সমগ্র অঞ্চলটির গড় উচ্চতা ২৪০ মিটারের মতো।

- রূঢ় অঞ্চলের প্রধান নদী রাইন নদী। এই নদী দক্ষিণে কোলন শহরের কাছে রূঢ় অঞ্চলে প্রবেশ করে পশ্চিম সীমানা বরাবর প্রবাহিত হয়েছে। রূঢ় এবং লিপে এই দুটি নদী এই অঞ্চলের পূর্বদিক থেকে প্রবাহিত হয়ে এসে রাইন নদীতে মিশেছে। নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে উর্বর পলিমাটি দেখা যায়। আর দক্ষিণে চার্নোজেম ও উত্তরে পড্‌সল মাটি দেখা যায়।

- রূঢ় অঞ্চলের জলবায়ু শীতল নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতির। গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা মাঝারি এবং শীতকাল বেশ শীতল। পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে সারাবছর ধরেই এখানে বৃষ্টিপাত হয়। যদিও পরিমাণে তা কম। গ্রীষ্মকালীন গড় উষ্ণতা ১৫°-২০° সে. শীতকালীন গড় উষ্ণতা ২°-৫° সে. এবং গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫০-৭০ সেমি.।

● কৃষি, শিল্প ও বসতির প্রয়োজনে এখানে বনভূমির সংখ্যা অনেক কমে গেছে। তবে শিল্পাঞ্চলের দূষণ রোধের জন্য কিছু সংরক্ষিত বনভূমি রয়েছে। পরিকল্পিত বনভূমিও সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সব বনভূমিতে পাইন,বার্চ,ওক, বিচ, ফার জাতীয় গাছ দেখা যায়।

রূঢ় শিল্পাঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিবেশ

● প্রধান খনিজ সম্পদ কয়লা, এই শিল্পাঞ্চলের প্রাণ। রাইন, লিপে ও রূঢ় নদীর মাঝের অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে অ্যানথ্রাসাইট ও বিটুমিনাস জাতীয় উৎকৃষ্ট মানের কয়লা পাওয়া যায়। যা এই অঞ্চলের শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এছাড়া বেশ কিছু জায়গায় খনিজ তেলও পাওয়া যায়।

● এই অঞ্চলের রেল, সড়ক ও জলপথ পরিবহণ ব্যবস্থা খুব উন্নত। শিল্প ও পরিবহণের উন্নতির কারণে সমগ্র অঞ্চলটি বেশ ঘনবসতি পূর্ণ। দক্ষিণ থেকে উত্তরে নিরবচ্ছিন্নভাবে জনবসতি দেখা যায়। রাইন নদীর পূর্বদিকে রাইন-হার্নে-ডর্টমুন্ড খাল ও উত্তরে লিপে খাল কাটা হয়েছে। নদীগুলি এই খালপথের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং সারাবছর নৌ-পরিবহণের উপযুক্ত। রূঢ় অঞ্চলের উত্তরে অবস্থিত হামবুর্গ বন্দর এই অঞ্চলের শিল্পোন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

● প্রধানত শিল্পাঞ্চল হওয়ার কারণে এখানে কৃষির পরিমাণ ও কৃষির গুরুত্ব দুটোই কম। শহরের পাশাপাশি অঞ্চলে মিশ্র কৃষি পদ্ধতিতে গম, যব, আলু, ওট, ফল, ফুল চাষের সঙ্গে পশুপালন এবং দুধ, মাংস উৎপাদন করা হয়।

রূঢ় অঞ্চলের শিল্প ও শিল্পকেন্দ্র

শিল্পের নাম	শিল্পকেন্দ্রের নাম
লৌহ ইস্পাত শিল্প	ডুইসবার্গ, মুলহাইম, এসেন, ডর্টমুন্ড, বখুম, গেলসিনকিরখেন, হ্যাম, হ্যাটিনজেন
ইঞ্জিনিয়ারিং, রেলইঞ্জিন, মোটরগাড়ি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি	ডর্টমুন্ড, বখুম, এসেন, ডুইসবার্গ, গেলসিনকিরখেন, হ্যাম, হ্যাগেন, গ্লাডবাক
রাসায়নিক (রং, ওষুধ, কীটনাশক, বিস্ফোরক দ্রব্য)	ডুইসবার্গ, হ্যাম, বট্রপ, রেকলিং, হার্ডজেন, গ্লাডবাক
সিমেন্ট শিল্প	এসেন, গেলসিনকিরখেন
বস্ত্রবয়ন শিল্প	এসেন, মোঁচেন, গ্লাডবাক, আচেন, ডুইসবার্গ, বট্রপ
বৈদ্যুতিক শিল্প	আচেন, বখুম, ডর্টমুন্ড
কাচ শিল্প	গেলসিনকিরখেন
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ	ডুসেলডর্ফ, ডুইসবার্গ

কোনো অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের জন্য কী কী প্রয়োজন হয় বুঝে নাও।

লন্ডন অববাহিকা

দীপাদের স্কুলে ভূগোল ক্লাসে আজ 'লন্ডন অববাহিকা' পড়ানোর কথা। তার আগে দীপারা নিজেদের মধ্যে লন্ডন সম্পর্কে আলোচনা করছিল। মলি বলল, 'লন্ডন শহর ইংল্যান্ডে অবস্থিত। আর ইংল্যান্ড হলো সেই দেশ যেখান থেকে ইংরেজরা ভারতে এসেছিল।' তিতলি বলল, 'কলকাতা শহর যেমন গঙ্গা নদীর ধারে অবস্থিত, তেমনি লন্ডন শহরটা টেমস নদীর ধারে গড়ে উঠেছে।' মুনাই বলল, 'লন্ডন শহরের কাছে গ্রিনিচের ওপর দিয়ে মূলমধ্যরেখা গেছে।'

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডন প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

একনজরে লন্ডন অববাহিকা

- **অবস্থান:** ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য।
- **সীমানা:** উত্তরে চিলটার্ন উচ্চভূমি, দক্ষিণে নর্থ ডাউনস্ উচ্চভূমি, পশ্চিমে রেডিং শহর এবং পূর্বে উত্তর সাগর।
- **আয়তন:** প্রায় ৭৭৬০ বর্গ কিমি।
- **অববাহিকার আকৃতি :** মাটির সরার মতো।
- **প্রধান নদী:** টেমস।
- **প্রধান বিমানবন্দর :** হিথ্‌রো।

লন্ডন অববাহিকার প্রাকৃতিক পরিবেশ

- ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত টেমস নদীর উভয় তীরে চিলটার্ন ও নর্থ ডাউনস নামক দুটো পর্বতের মধ্যবর্তী নিম্ন সমতলভূমিতে এই লন্ডন অববাহিকার অবস্থান। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডন এই অববাহিকায় অবস্থিত, তাই এর নাম **লন্ডন অববাহিকা**।

লন্ডন অববাহিকা অঞ্চলের প্রায় মাঝখান দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে টেমস নদী বয়ে চলেছে। টেমস নদীর মোহনার কাছাকাছি বা লন্ডন অববাহিকার পূর্বদিকে বিশেষ কোনো উচ্চভূমি দেখা যায় না।

তবে উৎস অঞ্চলে, বিশেষত উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকে চিলটার্ন, হোয়াইট হর্স ও নর্থ ডাউনস নামে তিনটি উচ্চভূমি লক্ষ করা যায়। অতীতে এই উচ্চভূমি অঞ্চলের মাঝখানের অংশ বসে গিয়ে এই নিম্নভূমির সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীকালে টেমস ও তার বিভিন্ন উপনদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে এই লন্ডন অববাহিকা অঞ্চলের উদ্ভব হয়েছে।

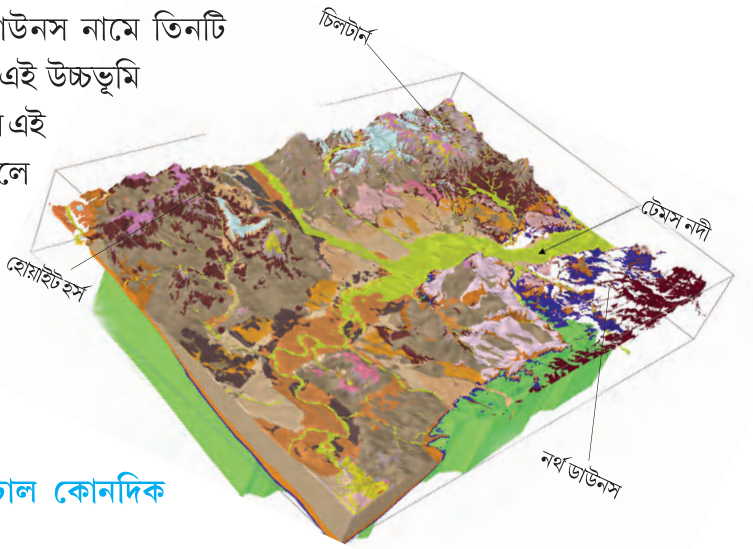

বলতে পারো?

সমগ্র লন্ডন অববাহিকার ঢাল কোনদিক থেকে কোনদিকে?

- লন্ডন অববাহিকা অঞ্চলের প্রধান নদী টেমস। এই নদী পশ্চিমে কটস্‌ওল্ডস্ পাহাড়ে উৎপন্ন হয়ে হোয়াইট হর্স ও চিলটার্ন পর্বতের মধ্যবর্তী গোরিং গ্যাপের মধ্য দিয়ে লন্ডন অববাহিকায় প্রবেশ করেছে। পরে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে উত্তর সাগরে গিয়ে মিশেছে। টেমসের প্রধান উপনদীগুলোর মধ্যে লি, রোডিং, ওয়ে, মোল প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উষ্ণতা : গ্রীষ্মকালীন ১৮°-২০° সে.
শীতকালীন ৩°-৫° সে.
বৃষ্টিপাত : ৬০-৭৫ সেমি.

- লন্ডন মানেই সারাবছর মেঘলা আকাশ, ঝিরঝিরে বৃষ্টি, শীতল ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া। পাশের সমুদ্র দিয়ে প্রবাহিত উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে শীতকালীন উষ্ণতা খুব কমে না। পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে এখানে সারা বছরই বৃষ্টিপাত হয়, যদিও এর পরিমাণ কম।
- ঘন জনবসতি, শহরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে এখানকার বনভূমির পরিমাণ খুবই কম। তবে উচ্চভূমি ও পাহাড়ের গায়ে কিছু ওক, বার্চ, অ্যাশ, লক, পাইন বিচ প্রভৃতি গাছের বনভূমি দেখা যায়।

লন্ডন অববাহিকার অর্থনৈতিক পরিবেশ

- বসতি ও শিল্পের প্রয়োজনে লন্ডন অববাহিকার বেশিরভাগ জমি ব্যবহৃত হয়। তবু স্থানীয় চাহিদা মেটানোর জন্য এখানে কিছু কিছু অঞ্চলে উন্নত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মিশ্র কৃষির মাধ্যমে কৃষিকাজ করা হয়ে থাকে। এখানকার কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রচুর পরিমাণে সবজি চাষ। বিপুল শহরবাসীর খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য ছোটো ছোটো খামারে ফল ও

শাকসবজি উৎপাদন করে ট্রাকে করে শহরে পাঠানো হয়। একে **ট্রাক-ফার্মিং** বলে।

ট্রাক ফার্মিং

নদী উপত্যকায় গম, যব, ভুট্টা আর চিলটার্ন ও ডাউনসের উচ্চভূমিতে মিশ্র কৃষি পদ্ধতিতে ওর্চ ও আলুর সঙ্গে পশুখাদ্য হিসাবে হে, স্লোভার ঘাসের চাষ করা হয়। পাশাপাশি উত্তর সাগর থেকে প্রচুর মাছও ধরা হয়।

- টেমস নদীর তীরে অবস্থিত লন্ডন শহরটি এখানকার প্রধান শহর, বন্দর এবং শিল্প বাণিজ্য কেন্দ্র। এই অঞ্চলে রেলপথ ও সড়কপথ জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। তাছাড়া লন্ডন যেমন একটি বিখ্যাত নদীবন্দর তেমনি আন্তর্জাতিক বিমানপথেরও কেন্দ্র। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে এখানে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন হয়েছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণে লন্ডন ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। মানুষের বাসস্থানের অভাব মেটাতে রেডিং, নিউব্যারি, ক্রয়ডন প্রভৃতি অনেক শহর গড়ে উঠেছে।

লন্ডন অববাহিকার শিল্প ও শিল্পকেন্দ্র	
ইঞ্জিনিয়ারিং	গিলফোর্ড
মোটরগাড়ি নির্মাণ	লুটন, অক্সফোর্ড
জাহাজ মেরামতি	চ্যাথাম
বিমান ও বিমান যন্ত্রাংশ	রিডিং, হ্যামেল হাম্পস্টেড
বৈদ্যুতিক ও কৃষিযন্ত্র	রেডিং, নিউব্যারি
ছাপাখানা বা মুদ্রণ	ওয়াচফোর্ড
কাগজ	পারফ্লিক্ট, নর্থফ্লিক্ট, ডার্টফোর্ড
রাসায়নিক, দেশলাই	লন্ডন
তথ্য প্রযুক্তি, বিস্কুট	রেডিং
ডেয়ারি ও ময়দা	লিচেস্টার, এসেক্স

লন্ডন শহর পশম, চা, রবার ইত্যাদি পণ্যের একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে খ্যাত। টেমস নদীর খাঁড়ি মুখে অবস্থিত লন্ডন বৃহত্তম **পুনঃরপ্তানি বন্দর**। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের উৎপাদিত দ্রব্য এখানে আসে এবং ক্রয় বিক্রয়ের পর এই বন্দর দিয়ে অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হয়।

পোল্ডারভূমি

একটা ছোট্ট দেশের ছোট্ট ছেলের গল্প। নাম ছিল তার হান্স। একদিন হান্স সন্ধের সময় রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ তার চোখ পড়ল রাস্তার পাশের উঁচু দেয়ালের গায়ের একটা ফাটল দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে। হান্সের বুকের ভেতরটা নিমেষে আতঙ্কে শিউরে উঠল আসন্ন বিপদের কথা ভেবে। ফাটলটা আরেকটু বড়ো হলেই ও পাশের সমুদ্রের জল হু হু করে গ্রামে ঢুকে পড়বে। আর ভাসিয়ে নিয়ে যাবে গ্রামের পর গ্রাম। তাই কোনো কথা না ভেবে হান্স তার হাতটা মুঠো করে ঢুকিয়ে দিল বাঁধের ফাটলের মধ্যে এবং ওই ভাবেই বসে রইল। রাতের দিকে তার বাবা মা আর গ্রামের লোকজন খুঁজতে খুঁজতে তাকে ওই ভাবে বসে থাকতে দেখতে পেল। তারপর তারা যখন জানতে পারল যে হান্স কীভাবে তাদের গ্রামকে রক্ষা করেছে তখন সবাই হান্সকে জড়িয়ে ধরল আর তার বীরত্বের জন্য খুব প্রশংসা করল। এই সুন্দর গল্পটা তো অনেকেরই জানা। জানো এই হান্স কোন দেশের ছেলে? হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ডের। আর যে অঞ্চলকে সে রক্ষা করেছিল তা হলো **পোল্ডারভূমি**।

পোল্ডারভূমি কী?

আসলে নেদারল্যান্ড দেশটা খুব ছোটো। তাই কৃষি ও অন্যান্য কাজের জন্য জমিরও খুব অভাব। এই সমস্যা দূর করার তাগিদে দেশের উত্তর পশ্চিমে জুইডার জি উপসাগরের বিশাল অগভীর জলভাগে উঁচু কংক্রিটের বাঁধ দিয়ে মাটি ভরাট করে নতুন ভূমি তৈরি করা হয়েছে। সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা এইসব নীচু সমতল ভূমিকে **পোল্ডারভূমি** বলে। নেদারল্যান্ডে একাদশ শতাব্দীতে প্রথম পোল্ডারভূমি তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। আগে তা করা হতো প্রাচীন পদ্ধতিতে। এখন প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সাথে সাথে এই কাজে আধুনিকতার ছোঁয়া এসেছে। নেদারল্যান্ডে প্রায় ৩ হাজারের বেশি ছোটো

বড়ো পোল্ডার রয়েছে। এদের মধ্যে **জুইডার জি** হলো সবচেয়ে বড়ো প্রকল্প। এছাড়া জিল্যান্ড, জিপে, জুইডপ্লাস, আনা পাওলোনা, প্রিন্স আলেকজান্ডার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পোল্ডারভূমি কীভাবে তৈরি করা হয়?

প্রথমে অগভীর জলাভূমি বা সাগরের কিছু অংশ চারিদিকে মাটি বা কংক্রিটের বাঁধ দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। এই বাঁধের ভিতরে জলনিকাশি চক্র খাল থাকে। এরপর এই ঘেরা জলাভূমি পাম্পের সাহায্যে কাদাজলে ভরাট করা হয়। জলাভূমির তলদেশে পলি থিতিয়ে যাওয়ার পর ওপরের জল পাম্পের সাহায্যে খাল দিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। তারপর পলি শুকিয়ে গেলে ওই জমিকে বেশ কয়েক বছর ফেলে রাখা হয় লবণমুক্ত করার জন্য। অবশেষে জমিকে কৃষিকার্যের উপযুক্ত করে তোলার জন্য সেখানে বেশ কয়েক বছর বিভিন্ন পশুখাদ্যের (হে, ক্লোভার) চাষ ও পশুপালন করা হয়। পরে জমি কৃষির উপযুক্ত হলে বীট, ওট, সূর্যমুখী, টিউলিপ প্রভৃতি শস্য ও ফুলের চাষ শুরু হয়।

পোল্ডারভূমি সৃষ্টির পদ্ধতি

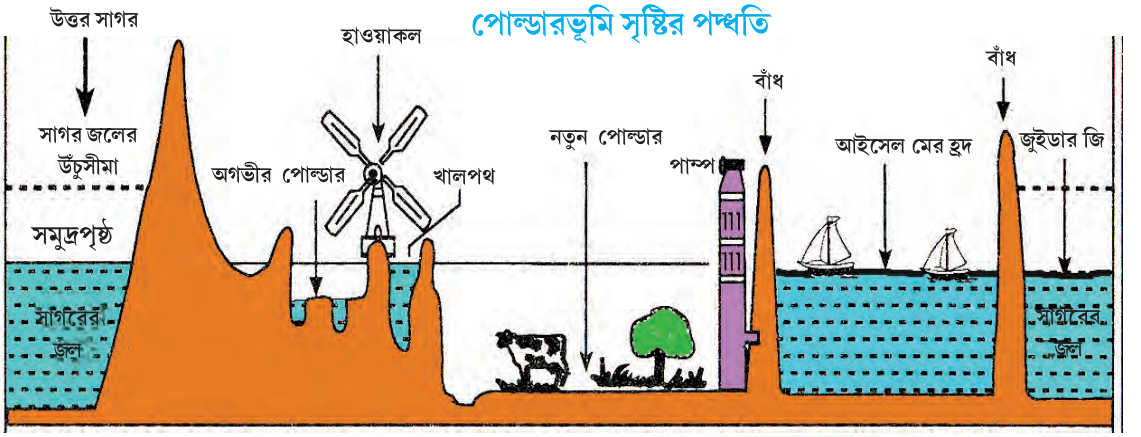

পোল্ডারভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশ

পোল্ডারভূমি হলো সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা নিম্ন সমতলভূমি। প্রধানত আইসেল, মাস এবং রাইন নদীর মধ্যবর্তী ব-দ্বীপের নীচু অংশে পোল্ডারভূমি গড়ে উঠেছে। সমগ্র পোল্ডার অঞ্চলকে ভূমির ব্যবহার অনুযায়ী ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—উত্তর ও উত্তর পূর্বে গ্রোনিং এন, ফ্রিজল্যান্ড ও ওভারিসেল, পশ্চিম ও মধ্যভাগে নুর্ড হল্যান্ড ও ডর্টরেচট এবং দক্ষিণে জুইড হল্যান্ড। এখানকার কোনো কোনো এলাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০ ফুটেরও নীচে অবস্থিত। বৃষ্টিপাতের ফলে জল জমলে তা পাম্প করে নিকাশি খালে ফেলে দেওয়া হয়। এখানকার বেশিরভাগ জায়গায় সমুদ্রের কাদামাটি দেখা যায়।

● এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে রাইন ও তার কয়েকটি উপনদী, যেমন—লেক, ভাল, মাস প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীগুলির ধারে পলিমাটি দেখা যায়।

● পোল্ডারল্যান্ড শীতল নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। তবে উষ্ণ উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রস্রোত এই অঞ্চলের পাশ দিয়ে বয়ে যায় বলে এখানকার জলবায়ু **সমভাবাপন্ন** অর্থাৎ শীতকাল খুব শীতল নয় (গড় তাপমাত্রা ৩° সে.) আবার গ্রীষ্মকালও খুব তীব্র নয় (গড় তাপমাত্রা ১৬° সে.)। পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে এখানে সারাবছরই বৃষ্টি হয়। তবে এর পরিমাণ খুব কম (বার্ষিক গড়ে ৭০ সেমি.)। এখানে ওক, বার্চ ইত্যাদি বৃক্ষ এবং তৃণভূমির প্রাধান্য দেখা যায়।

পোল্ডারভূমির অর্থনৈতিক পরিবেশ

● নতুন পোল্ডারগুলিতে জমির লবণাক্ততা কমানোর জন্য হে, ক্লোভার প্রভৃতি ঘাসের চাষ করা হয়। গম, ওট, যব, রাই, আলু প্রভৃতি চাষ করা হয় পুরোনো লবণমুক্ত জমিতে। এখানকার বেশিরভাগ খামারগুলিতে মিশ্রকৃষি পদ্ধতিতে চাষের কাজ করা হয়। এখানকার বিস্তীর্ণ জমিতে নানারঙের টিউলিপ, কসমস, গ্ল্যাডিওলি প্রভৃতি ফুলের চাষ করা হয়। আবার শীতল ও কম আলোযুক্ত অঞ্চলে গ্রিনহাউস বা কাচের ঘরে সবজির চাষ করা হয়।

● পোল্ডারভূমির শিল্প ও পরিবহণ ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। চক্রখালগুলিও পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে খনিজ সম্পদের বিশেষ অভাব রয়েছে। গ্রোনিয়েন অঞ্চলে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। আর **দি হেগ** এর কাছে খনিজ তেল পাওয়া যায়। আমস্টারডাম, রটারডাম, গ্রোনিয়েন, হার্লেম, লেভেন, ইজমুইডেন, দি হেগ, ফ্লাশিং প্রভৃতি শহরগুলিতে লৌহ-ইস্পাত, পেট্রো-রাসায়নিক, জাহাজ নির্মাণ, ডেয়ারি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কাগজ, চামড়া, প্রসাধনী প্রভৃতি শিল্প গড়ে উঠেছে।

● কৃষি, শিল্প ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে পোল্ডারভূমির জনবসতি খুব ঘন। এখানকার প্রধান শহর আমস্টারডাম নেদারল্যান্ডের রাজধানী এবং বিখ্যাত বন্দর। হিরে কাটা ও পালিশ শিল্পের জন্যও আমস্টারডাম পৃথিবী বিখ্যাত।

তোমার পাতা

তোমার পাতা

সপ্তম শ্রেণি

নমুনা প্রশ্নপত্র

১। বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো :—

(ক) অনুসূর অবস্থান উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্ম/শীত/শরৎ/বসন্ত ঋতুতে হয়।

(খ) এশিয়া ও ইউরোপের মাঝে রয়েছে ইউরাল পর্বত/লোহিত সাগর/সুয়েজ খাল/আল্পস পর্বত।

২। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন/অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

(i) শূন্যস্থান পূরণ করো :—

(ক) নিরক্ষরেখার সমান্তরালে বৃত্তাকার কল্পিত রেখাগুলি হলো _____।

(খ) এশিয়ার দীর্ঘতম নদীর নাম হলো _____।

(ii) শুদ্ধ/অশুদ্ধ লেখো :—

(ক) ২১ জুন তারিখে পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয়।

(খ) ১৯৮৪ সালে ভারতের ভুপালে গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটেছিল।

(iii) স্তম্ভ মেলাও :—

বামদিক	ডানদিক
মূলমধ্যরেখা	মিলিবার
বায়ুচাপ	জলপ্রপাত
নদীর ক্ষয়কার্য	গ্রিনিচ

(iv) এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) নিম্নপ্রবাহে নদীর প্রধান কাজ কী?

(খ) একটি তেজস্ক্রিয় দূষকের নাম বলো?

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন [প্রতিটি প্রশ্নের মান ২]

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (অনধিক দু-তিনটি বাক্য)

(ক) আন্তর্জাতিক নদী বলতে কী বোঝ?

(খ) O P E C কী?

৪। সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩)

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (অনধিক ছটি বাক্য)

(ক) অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার পার্থক্য করো।

(খ) জলদূষণ প্রতিরোধে তুমি কী কী করতে পারো?

৫। ব্যাখ্যামূলক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৫)

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (অনধিক দশটি বাক্য)

(ক) উত্তর গোলার্ধে কীভাবে গ্রীষ্মকাল হয় তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।

(খ) বায়ুচাপের তারতম্যের কারণগুলি ব্যাখ্যা করো।

(গ) ভঙ্গিল পর্বত ও স্তূপ পর্বতের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

৬। পৃথিবীর রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিতগুলি প্রতীক ও চিহ্নসহ বসাও (প্রতিটির মান ১)।

(ক) হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণি (খ) কঙ্গো নদী (গ) সাহারা মরুভূমি (ঘ) কৃষ্ণসাগর (ঙ) টোকিও শহর।

ওপরের নমুনা ছাড়াও অন্যান্য ধরনের প্রশ্ন দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

- নীচের রেখাচিত্রে পৃথিবীর অবস্থান, অবস্থানের তারিখ, সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব উল্লেখ করে খাতায় লেখো।

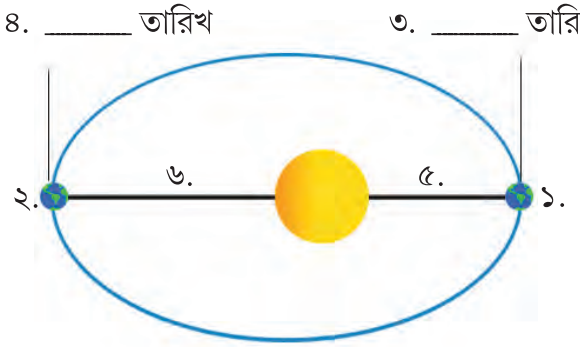

- নীচের ছবিটি শনাক্ত করো। এই ভূমিরূপটি নদীর প্রবাহের কোন পর্যায়ে দেখা যায় লেখো।

শব্দছক সমাধান, শব্দের ধাঁধা, ধারণা মানচিত্র তৈরি, তথ্য মৌচাক পূরণ, বেমানান শব্দ শনাক্তকরণ (Odd one out), ভুল সংশোধন, 'আমি কে' (যেমন— আমি মাত্রাহীন 'ব' অক্ষরের মতো দেখতে ভূমিরূপ। আমি কে?) ইত্যাদি ধরনের প্রশ্ন।

সপ্তম শ্রেণির বাৎসরিক পাঠ্যসূচি বিভাজন

পর্ব -I	পর্ব - II	পর্ব - III
পাঠ একক	**পাঠ একক**	**পাঠ একক**
১. পৃথিবীর পরিক্রমণ	১. ভূমিরূপ	১. জলদূষণ
২. ভূপৃষ্ঠে কোনও স্থানের অবস্থান নির্ণয়	২. নদী	২. মাটিদূষণ
৩. বায়ুচাপ	৩. শিলা ও মাটি	৩. ইউরোপ মহাদেশ
৪. এশিয়া মহাদেশ	৪. আফ্রিকা মহাদেশ	

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ তৃতীয় পর্বভিত্তিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দেশিত পাঠ একক ছাড়াও প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব থেকে যথাক্রমে 'পৃথিবীর পরিক্রমণ, ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়, বায়ুচাপ, ভূমিরূপ, নদী' পাঠ এককগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

তৃতীয় পর্বভিত্তিক মূল্যায়নে ৫ নম্বর মানচিত্র চিহ্নিতকরণ (পৃথিবীর মানচিত্রে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত বিষয়) আবশ্যিক করতে হবে।

শিখন পরামর্শ

সপ্তম শ্রেণির এই ভূগোল বইটি শুধুমাত্র একটি বই নয়। বইটিতে শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও তার নিজস্ব চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি কোণে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী যাতে বইটির রসাস্বাদন করতে পারে তার জন্যই এই প্রয়াস।

শিক্ষক/শিক্ষিকার প্রতি—

- প্রাকৃতিক ও আঞ্চলিক ভূগোল বিভাগের প্রতিটি অধ্যায়ে মূল বিষয়ের ধারণা স্পষ্ট করার জন্য প্রচুর ধারণা মানচিত্র, আলোকচিত্র, সহজ মানচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষার্থীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, অনুমান, সংস্কার, বিশ্বাসকে কাজে লাগাতে হবে।

- শিক্ষার্থীরা যখন আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসবে, আপনি মূল বিষয়ে প্রবেশ করবেন। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর বিষয়গত ধারণা পরিষ্কার হয়েছে কিনা তা জানাবার পথ তৈরি করতে হবে। প্রশ্ন করে তাকে অপ্রস্তুত করে নয়, বরং গল্পের ছলে বা খেলার ছলে কাজটা করতে হবে।

- বইটিতে 'অনুসন্ধান', 'সমীক্ষা', এবং 'হাতেকলমে'র উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর নিজস্ব পরিবেশ সচেতনতা এবং মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করা। এই প্রসঙ্গে অন্য কোনো উদ্ভাবনী পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করানো যেতে পারে।

- নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন করার জন্য নিজস্ব নোট-খাতা তৈরি করবেন। সেখানে শিক্ষার্থীর নামের সঙ্গে দুটি বা তিনটি পৃষ্ঠা রাখবেন। তাতে প্রতিদিন কিছু মন্তব্য লিখবেন। মন্তব্যগুলি একমাস বা দু-মাস অন্তর অভিভাবক/অভিভাবিকার সঙ্গে আলোচনা সভায় আলোচনা করবেন।

- আঞ্চলিক ভূগোল বিষয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে সব জানার বিষয়গুলো রাখা সম্ভব হয়নি। তথ্য বিশ্লেষণের দিকে জোর দেবেন। শিক্ষার্থীরা তথ্য, ছবি সংগ্রহ করবে, দলগতভাবে শ্রেণিকক্ষে তথ্য ও ছবির কোলাজ তৈরি করে মূল বিষয় অনুধাবন করবে।

- আপনার সক্রিয় সহায়তা ছাড়া শিক্ষার্থীরা শিখনস্তর অতিক্রম করতে পারবে না ঠিকই, তবে শ্রেণিকক্ষে/শ্রেণিকক্ষের বাইরে আপনিই 'মুখ্য'—এই ভাব প্রদর্শন কখনই করবেন না। শিক্ষার্থীকে স্বাধীনতা দেবেন, যাতে সে নিজেই বিষয়গুলোকে বুঝতে পারে।

- পিছিয়ে পড়াদের দিকে বিশেষ নজর দেবেন। যারা খুব সহজে শিখন স্তরে অগ্রসর হতে পারে, শুধুমাত্র তারা বুঝতে পারলেই নিশ্চিন্ত হবেন না। প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে সক্রিয়তাভিত্তিক শিখনে অংশগ্রহণ করে সেইদিকে নজর দেবেন।

- শিক্ষার্থীদের নিজস্ব পরিবেশেই যে ভূগোলের বিষয়বস্তু লুকিয়ে আছে তা উদ্ভাবন করার কাজে সাহায্য করবেন।

- আশপাশের পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করার জন্য শিক্ষার্থীদের বছরের কোনো একদিন কৃষিক্ষেত্র, জলাশয়, কারখানা বা সম্ভব হলে চিড়িয়াখানা, বনাঞ্চলে নিয়ে যাবেন। তারা ঘুরে এসে নিজস্ব প্রতিবেদন তৈরি করবে।

- শিক্ষার্থীদের কোনো কাজে ত্রুটি হলে সেটাকে ভুল বলবেন না। শিক্ষার্থীর ভুল ধারণাকে সঠিক ধারণায় নিয়ে যেতে হবে বাস্তব অভিজ্ঞতার উদাহরণ দিয়ে।